মাওলানা আলাউদ্দিন আল-আযহারীর

জীবন ও কর্ম

ড. মাওলানা মুহাম্মাদ মোস্তাফিজুর রহমান

প্রকাশনায়
আলাউদ্দিন আল-আযহারী ফাউন্ডেশন

মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারীর জীবন ও কর্ম

মূল ও সংকলনে

ড. মাওলানা মুহাম্মাদ মোস্তাফিজুর রহমান

ও

মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হোসাইন খান

সম্পাদনায়

মোঃ মতিউর রহমান, বি.এ (অনার্স) এম. এ

সচিব (অবঃ)

সহযোগিতায়

মোঃ ইলিয়াস হোসেন

ও

মোঃ রফিকুল ইসলাম

বিঃ দ্রঃ আলাউদ্দীন আল আযহারী ওয়া খিদমাতুহু ফী নাশরিল লুগাতিল আরাবিয়্যা ফী বাংলাদেশ (আলাউদ্দীন আল আযহারী ও বাংলাদেশে আরবী প্রসারে তাঁর অবদান) শিরোনামে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত থিসিস ও অন্যান্য লেখার আলোকে রচিত।

প্রকাশনায়

আলাউদ্দীন আল-আযহারী ফাউন্ডেশন

ডাকঘর : সাহেব রামপুর, উপজেলা : কালকিনি

জেলা : মাদারীপুর। মোবাইল : ০১৭১২২২১১৪০

প্রাপ্তিস্থান

উম্মুল কুরা প্রকাশনী

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার (দোতলা)

দোকান নং-৫, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৮১৪৩৫৩৭৫৮

সার্বিক সহযোগিতায়

Institute of Basic Arabic Learning

মদীনা মনযিল ৩৫৭/এ/৯/২ মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন ঃ ৯৩৩৭৩৮৯, মোবাইল ঃ ০১৭১৫৪৩২০২১

প্রকাশকাল

রমজান ঃ ১৪২৮ হিজরী

সেপ্টেম্বর ঃ ২০০৭ ঈসায়ী

আশ্বিন ঃ ১৪১৪ বঙ্গাব্দ

বর্ণ বিন্যাস

মোহাম্মদ এনায়েত হোসেন

১৫/৪-এ মীরবাগ, ঢাকা-১২১৭

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৩০.০০ টাকা

সূচিপত্র

ভূমিকা

'মরণেরে স্মরণের আবরণে রাখি ঢাকি
জীবনেরে কে রাখিতে পারে।'

বাংলাদেশে আধুনিক আরবীর পথ-প্রদর্শক ও প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন, বহু ভাষাবিদ, সংগঠক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আলাউদ্দীন আল আযহারী তাঁর স্বল্প হায়াতে দ্বীন ও আরবী ভাষার যে সেবা করে গেছেন যা চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। নিজে শত প্রচারবিমুখ হলে সমাজ ও যুগ তাঁর অবদানকে স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেনি। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর জীবনীর ওপর গবেষণাকর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই উহা সম্পাদনে সম্মতি প্রদান করে তাঁকে যথাযথ মূল্যায়ন করেছে। এর মাধ্যমে এ প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন সম্পর্কে অবগত হয়ে ভবিষ্যত প্রজন্ম তাঁর মতো দ্বীনের খেদমতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে অনুপ্রাণিত হবে এটা আমাদের প্রত্যাশা।

ভাবতে অবাক লাগে যে আরবী সাহিত্যের পাদপীঠ নামে খ্যাত মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায়ই এই শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে তিনি এক বিরল নজির সৃষ্টি করেছেন। বাংলা ভাষায় তথা বাংলাদেশে আজকে আধুনিক আরবীর যতটুকু চর্চা বিশেষ করে আরবী সাংবাদিকতা ও আধুনিক আরবীর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর যে কাজ হয়েছে তা তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল।

তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইলমের এ মিশনকে চালিয়ে নিয়েছেন যুগ পরিক্রমায় তার প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁর অসমাপ্ত কাজকে যেকোনো মূল্যে বাস্তবায়ন করতে পারলে তাঁর বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে ও তাঁকে প্রকৃতভাবে মূল্যায়ন করা হবে। দেরীতে হলেও তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত ফাউন্ডেশন সময়ের দাবী অনুযায়ী তাঁর জীবন ও কর্ম প্রকাশ করে এক প্রশংসনীয় কাজ করে যা সকল মহলে সমাদৃত হবে এ বিশ্বাসে স্থিত হওয়া যায়। স্বল্প সময় সংকলন ও সম্পাদনার কাজ করায় ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক যা আশা করি সংশ্লিষ্ট সকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। মাওলানা আযহারীর জীবন ও কর্ম লেখার মতো মহতী উদ্যোগ ও কাজের জন্য ড. মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ও মাওলানা মুফাজ্জল হোসাইন খানকে মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়া এতদসংক্রান্ত বিভিন্নভাবে সহযোগিতার জন্য জনাব মো: ইলিয়াস হোসেন ও জনাব মো: রফিকুল ইসলাম সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ সকলকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন।

ঢাকা
১৩.০৯.২০০৭ ইং

মোঃ মতিউর রহমান
সচিব (অব:)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রকাশকের কথা

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা আলাউদ্দিন আল-আযহারী। সংক্ষিপ্ত জীবনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁর বিশাল অবদান রয়েছে। বিশেষ করে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশকে একটি মুসলিম অধ্যুশিত দেশ হিসেবে মুসলিম বিশ্বের নিকট পরিচিত করতে তাঁর অবদান চির স্মরণীয়। শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত থেকেও তিনি নিজেকে একজন লেখক, সমাজ সেবক ও যোগ্য সংগঠক হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও বাংলাদেশে আধুনিক আরবী ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি হলেন মডেল। তাঁর জীবন ও কর্ম শীর্ষক বই প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। নতুন প্রজন্ম তাঁর ব্যাপারে যে অন্ধকারে আছে, আযহারী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রকাশিত উক্ত বইটির মাধ্যমে তা কেটে যাবে বলে আশা করি। বইয়ের মাধ্যমে আলেম সমাজ পাবে একই সময়ে নিজেকে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কাজ আঞ্জাম দেয়ার প্রেরণা। প্রকাশনার ব্যাপারে সবার দোয়া ও পরামর্শ কামনা করে শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন। আল্লাহ হাফেজ।

মোহাম্মদ খায়রুল আনাম
সভাপতি
আলাউদ্দিন আল-আযহারী ফাউন্ডেশন

অভিনন্দন বাণী

আমার স্বামী মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার সাহেবরামপুর গ্রামের কৃতি সন্তান। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারীর "জীবন ও কর্ম" বিষয়ের উপর স্নেহ ভাজন ড. মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান আরবী ভাষায় পি.এইচ.ডি থিসিস রচনা করে মরহুমের অমূল্য জীবন ও কর্মকে দেশ ও জাতির কাছে চির স্মরণীয় করে রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, এজন্য আমি আমার অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে তাকে জানাচ্ছি দোয়া ও মুবারকবাদ।

উপরোক্ত থিসিস খানার সার সংক্ষেপের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থটির প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করেছে "মরহুম মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী ফাউন্ডেশন।"

মরহুম মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারীর আরাধ্য কর্মসমূহ সম্পাদন করার শপথদীপ্ত এই সংস্থাটি ও সমাজ সেবামূলক কাজ সফলতার সাথে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। আর এ জন্য সংস্থার সকলের প্রতি আমার আন্তারিক শুভেচ্ছাও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সংস্থাটির যাবতীয় উদ্যোগ কবুল করুন। আমীন!

জাহান আরা বেগম
১৪.০৯.০৭
১১৮, বড় মগবাজার
কাজী অফিস লেন, ঢাকা-১২১৭

মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারীর স্নেহধন্য ছাত্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমানের

অভিমত

আল্লামা আলাউদ্দীন আল-আযহারী বাংলাদেশে আরবী ভাষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। আগে এদেশের মানুষ আরবী ভাষাকে প্রধানত একটি ধর্মীয় ভাষা মনে করত। তিনিই প্রথম আরবীকে এদেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে আজকের দিনেও একটি জীবনের ভাষা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে আরবীকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করতেও তিনি আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান। একজন নিবেদিত শিক্ষক হিসেবে তিনি আরবী শিক্ষাদানে ব্যতিক্রমী পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। রচনা করেছিলেন আরবী শিক্ষাসংক্রান্ত বেশকিছু উন্নতমানের বইপত্র। এ ক্ষেত্রে তাঁর রচিত আরবী-বাংলা অভিধান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষক ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন উঁচু মানের দা'ঈ ইলাল্লাহ। দ্বীনের খেদমতে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। অসংখ্য সভা-সমাবেশে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়েছেন। গড়ে তুলেছিলেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন ভাষায় রচনা করেছেন অনেক মূল্যবান বই-পুস্তক।

অপার মনীষার অধিকারী বাংলাদেশের এই শ্রেষ্ঠ আরবী শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদের অবদান নিয়ে রচিত হয়েছে "মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারীর জীবন ও কর্ম" শিরোনামের ছোট্ট অথচ মূল্যবান এই বইটি। বইটিতে এই মনীষীর বিস্তারিত জীবনী আলোচনা করা হয়েছে; সমাজের প্রতি তাঁর বহুমুখী অবদান উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর রচনাবলীর বিবরণ ও মূল্যায়ন স্থান পেয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রন্থটি রচনা করার জন্য গ্রন্থকার ড. মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আর গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য মোবারকবাদ জানাই আলাউদ্দীন আল-আযহারী ফাউন্ডেশনকে। বইটি পড়ে এদেশের মানুষ এদেশেরই এক সুসন্তান অমর শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ মরহুম মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারবে এবং উত্তম মানুষ হিসেবে নিজেদের জীবন গড়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী

[জীবনকাল ৩১শে মার্চ ১৯৩০ থেকে ২৭শে মার্চ ১৯৭৮]

পরিচিতি

জন্মস্থান : তৎকালীন ফরিদপুর বর্তমান মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার সাহেবরামপুর ইউনিয়নের আকন্দ বাড়িতে নিজ পিত্রালয়ে।

পিতা : আলহাজ মুন্সি আব্দুল করিম। তৎকালীন সময়ের প্রখ্যাত আলেম।

মাতা : আম্বিয়া খাতুন। একজন কিতাব পড়া নেককার মহিলা। তিনি গ্রামের মহিলাদের ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন।

দাদা : মোহাম্মদ ফয়েজউদ্দীন মুন্সি। সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি।

নানা : মাওলানা মুহাম্মদ তাজউদ্দীন। বর্তমান মাদারীপুরস্থ কালকিনি থানার অন্তর্গত এনায়েত নগর সিনিয়র মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও প্রখ্যাত অলিয়ে কামেল।

পারিবারিক ঐতিহ্য

এতদঞ্চলে পূর্ব থেকেই এই পরিবারটি একনিষ্ঠভাবে ইসলামী বিধি-বিধান পালনে সচেষ্ট ছিল। তাই এলাকার সবার অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল এই পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি যা আজ পর্যন্ত এতটুকুও ক্ষুণ্ন হয়নি।

শৈশবকাল

আল্লাহ পাক যার মাধ্যমে খেদমত গ্রহণ করবেন তাঁকে বাল্যকাল থেকেই ঐ পরিবেশে গড়ে উঠার সুযোগ করে দেন। আযহারীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। অন্যান্য শিশুদের থেকে আলাদা ও স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য নিয়েই আযহারী বেড়ে ওঠেন। তাঁর এ স্বাতন্ত্র্যবোধই তাঁকে এত বড় হতে বেশ সহায়তা করে।

শিক্ষাজীবন

মূলত আলউদ্দীন আল আযহারীর শিক্ষার হাতেখড়ি বাবা-মার কাছেই হয়। সাথে সাথে পারিবারিক মক্তবেই দ্বীনি শিক্ষা সম্পন্ন করেন। একটু বয়স বৃদ্ধি হলেই নানার প্রতিষ্ঠিত এনায়েত নগর সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখানে

কয়েক বছর লেখাপড়া করেন। সেখানে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করে সাহেবরামপুর হাই মাদরাসায় (বর্তমানে সাহেবরামপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়) ভর্তি হন এবং শিক্ষা সম্পন্ন করেন। এ সময় তাঁর অন্যতম শিক্ষক হিসেবে আবদুল হামিদ মাষ্টার যিনি পরবর্তীকালে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে গভর্নরের স্বর্ণপদক লাভ করেন। এরপর এক বছর কুরআন শরীফ বিশুদ্ধভাবে শিক্ষার নিমিত্তে কয়ারিয়া কারামতিয়া ফোরকানিয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত তথা ইলমে কিরাত শেখেন। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সময়ে উক্ত মাদরাসার শিক্ষক বিশিষ্ট ক্বারী মুহাম্মদ আব্দুল কাদের মক্কা মুকাররমা থেকে কুরআনের ইলমে কিরাতসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

এরপর তিনি শিক্ষার জন্য এলাকার বাহিরে গমনের ইচ্ছা করেন। যৎসামান্য পাথেয় ইলমে দ্বীন হাসিলের গভীর স্পৃহা নিয়ে চাঁদপুর উসমানিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন ও উক্ত মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ উসমান গণি সাহেবের বাড়িতে লজিং থেকে তাঁর লেখাপড়া চালিয়ে যান। ১৯৪৭ সালে আলিম পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থানসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। একই মাদরাসা থেকে ১৯৪৯ সালে ফাজিল পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থানসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

উল্লেখ্য যে তৎকালীন সময়ে বর্তমান নিয়মে দাখিল পর্যায়ে কোনো কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ছিল না। উসমানিয়া মাদরাসাটি আযহারী সাহেবের শত পছন্দ হলেও সেখানে কামিল শ্রেণী না থাকায় বাধ্য হয়ে উপমহাদেশের প্রাচীনমত শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকাতে কামিল হাদিসে ভর্তি হন।

যুগশ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের সংস্পর্শে এসে তিনি লেখাপড়ার গতি আরো বৃদ্ধি করে দেন।

তাঁর শিক্ষকগণও তাঁর আগ্রহ ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে নিজেদের যোগ্য উত্তরসূরি গড়ার নিমিত্তে শিক্ষাদান করতে থাকেন। সিলেবাসের তোয়াক্কা না করে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের জন্য লেখাপড়া শুরু করেন। অল্পদিনের মাঝেই তিনি আদর্শ শিক্ষার্থীরূপে আবির্ভূত হন। শিক্ষকগণ তাঁকে মডেল হিসেবে পেশ করতে থাকেন। ১৯৫১ সালে কামিল হাদিস পরীক্ষায়ও আযহারী সাহেব মেধা তালিকায় স্থানসহ প্রথম বিভাগে উন্নীত হন। বিদ্যার নেশা যাঁকে একবার পেয়ে যায় সে তা শেষ না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। আযহারী সাহেবও দেশের শিক্ষাপর্ব শেষ করে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্বের প্রধান ইসলামী বিদ্যাপীঠ আল আযহার

বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি বৃত্তি নিয়ে গমন করেন। সেখানে ধর্মীয় অনুষদে উসূলুদ্দীন বিভাগে পড়াশোনা শুরু করেন। অল্পদিনের মাঝেই তিনি ওখানেও শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। প্রত্যেকটি সেমিস্টারে অভাবনীয় রেজাল্ট করে দেশের ভাবমূর্তি বিদেশের মাটিতে সমুন্নত করেন। সিলেবাসের বাইরেও বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হন। এমনকি আরবী ভাষাভাষীদের মত আরবী ভাষারীতি রপ্ত করতে সক্ষম হন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান ও দেশ থেকে আগত সহপাঠীদের সহায়তায় বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষার প্রায় সতেরটি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন যা তিনি অনর্গল বলতে ও লিখতে পারতেন। মূলত আযহারী আল আযহারের আঙ্গিনায় মনের খোরাক ও পরিবেশ পেয়েছিলেন। যা বিভিন্ন ডিগ্রী অর্জনে তাঁকে সহায়তা করে।

কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরব উপস্থিতি তাঁকে আরও যোগ্য করে তোলে। অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবেও তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

উল্লেখ্য যে, সরকারি বৃত্তিতে তাঁর পুরো খরচ হতো না। এরপরে বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত বৃত্তি ও অনুদান তাঁর উদ্বৃত্ত থেকে যেত। তা দিয়ে তিনি সকল প্রকার চাহিদা পূরণ ও সকল আত্মীয়-স্বজনের আবদার অনায়াসে পূরণ করতে পারতেন। তাই নিশ্চিন্ত জীবন-যাপনের মাধ্যমে স্বাধীনচেতা মন নিয়ে বেড়ে ওঠেন। জাতিকে কিছু দেবার নিমিত্তে তিনি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রাবাসের একজন আবাসিক ছাত্র হলেও তিনি বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রায় ২ হাজার ছাত্রের সাথে ওঠাবসা করতেন। এতে করে তিনি একজন আন্তর্জাতিক লোকে পরিণত হন।

অনার্স পর্যায়ের শিক্ষা সমাপনের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আইন যে, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ না করলে তাদের বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাই তিনি একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে অন্যান্য ছাত্রদের মত দেশে ফিরে না এসে ওখানে এম. এ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে যান।

তথায় তিনি উসূলুদ্দীন (ইসলামিক মূলতত্ত্ব) বিষয়ে আন্তর্জাতিক আলামিয়া সনদ লাভ করেন। একই সময় তিনি কায়রোস্থ আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে প্রাচ্য শিক্ষা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। সেখান থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন। এমনিভাবে সাতটি বছর তিনি মিশরে পড়ে ও পড়িয়ে দা'য়ী ইলাল্লার দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে ১৯৫৭ সনে দেশে ফিরে আসেন।

কর্মজীবন

কোনো ব্যক্তির সফলতা নিরূপণ করা হয় তার কর্মজীবনের ওপর ভিত্তি করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আযহারী একজন সফল ব্যক্তি। সকল ক্ষেত্রেই তিনি সফল হয়েছেন। মনে হয় যেন তাঁর হাতে ছিল সফলতার যাদুরকাঠি। একই সাথে তিনি শিক্ষক, দ্বীনের মুবাল্লিগ, নির্ভীক সমাজকর্মী, সচেতন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রখ্যাত লেখক, সফল সংগঠক, সমাজসেবক সর্বোপরি একজন আধ্যাত্মিক সাধক। এতগুণের অধিকারী ছিলেন বলেই এ ক্ষুদ্র জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসমান্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর জীবনের ব্রতই ছিল কাজ আর কাজ। তাঁর কর্মজীবনকে প্রধানত দুটো পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

এক. দ্বীনি শিক্ষা দান

দুই. ইসলামী দাওয়াত

এক. দ্বীনি শিক্ষা দান

ক. আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগদান

অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী আল আযহারী তৎকালীন সময়ে যেকোনো সরকারি প্রশাসনিক পদে অনায়াসে ঢুকতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁর আহরিত জ্ঞানকে মানুষের মাঝে বিলানোর নিমিত্তে শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। মূলত তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছে ছাত্র অবস্থা থেকেই। ১৯৫৬ সালে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় অনুষদের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ইহা এক আশ্চর্য বিষয় ভিনদেশী অনারবী একজন লোক মিশরের মতো দেশে এ পদে নিয়োগ পেয়েছেন। যার দ্বিতীয় নজির নেই। উল্লেখ্য আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনরূপ ছাড় প্রদান বা পক্ষপাতিত্ব করে না। সবদিক থেকে যোগ্য প্রার্থীকেই নিয়োগ প্রদান করে। আল আযহারী সমস্ত কিছুকে রক্ষা করেই ১৯৫৭ সালে দেশে ফেরা পর্যন্ত উক্ত পদে আসীন ছিলেন।

খ. বাংলা একাডেমীতে অনুবাদক হিসেবে যোগদান

আযহারী সাহেব দেশে ফেরার পরেই দ্রুত বিদ্যুৎ বেগে তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁর চাকরির অনেক প্রস্তাব আসতে থাকে। জ্ঞান-চর্চার সাথে মোটা বেতনের চাকরিও তিনি ফিরিয়ে দেন।

পরিশেষে তিনি জ্ঞান অর্জনের মুখ্য সুযোগ হিসেবে বাংলা একাডেমীর অনুবাদ ও গ্রন্থনা বিভাগের উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। এ স্থলে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে বিরাট সুযোগ মনে করে একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে থাকেন। সাথে সাথে মনমাতানো আরবীর ভঙ্গিমায় আরবী বক্তৃতা ও উত্তমভাবে সাবলীল বাংলায় অনুবাদ করে মানুষকে তাক লাগিয়ে দেন। ১৯৫৯ সালে মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসের বাংলাদেশে সফরে আসলে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত পরিচিতি সভায় তাঁর বক্তৃতার যে বঙ্গানুবাদ করেছিলেন তা আজও শ্রোতাদের কানে বাজে ও মনে শিহরণ জাগায়। তেমিনভাবে বাংলাদেশে সফররত ইরাকী প্রেসিডেন্ট ও সরকারি আলিয়া মাদরাসা ঢাকার দু'শত বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সভায় আগত বিভিন্ন ভাষা-ভাষী প্রতিনিধিদলের ভাষণ অনুবাদ করে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর সমকক্ষ আজও খুঁজে পাওয়া যায় না। এক কথায় বলতে গেলে ঢাকায় আগত তৎকালীন আরব দেশের মেহমানদের যোগ্য অনুবাদক তিনি একাই ছিলেন। তিনি বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য ছিলেন।

গ. সরকারি আলিয়া মাদরাসায় যোগদান

১৯৫৯ সালেই তিনি সরকারি আলিয়া মাদরাসা ঢাকার আধুনিক আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং পদোন্নতি পেয়ে এডিশনাল প্রধান মাওলানা হিসেবে উন্নীত হন। আমৃত্যু তিনি উক্ত মাদরাসাতেই এডিনাল হেড মাওলানা হিসেবে এবং বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কর্মরত ছিলেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি অসংখ্য শিক্ষার্থীকে অনুপম শিক্ষাদান করেন। কিছুদিন তিনি উর্দু ডিপ্লোমা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। তাঁর ছাত্ররা দেশ-বিদেশে সুনামের সাথে কাজ করছেন। যারা তাঁরই কৃতিত্বের ফসল। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও পরিচিত তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো ঃ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জাল হোসাইন খাঁন প্রমুখ।

আরবী ভাষার প্রচার ও প্রসারই ছিল তাঁর নেশা। তাই তিনি এর সার্বিক বিস্তারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। এর ধারাবাহিকতায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে যোগদান করেন।

মূলত আল-আযহারীর কাজ ছিল ভাষাবিষয়ক। ভাষাবিষয়ক সকল কাজে তিনি প্রচুর উৎসাহ পেতেন। সত্যিকার অর্থে তারই প্রচেষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে আরবী বিভাগ চালু হয়। তিনি এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ভাষা শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তথায় তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতিতে মুগ্ধ হয়ে সাধারণ শিক্ষিত অনেক লোক তাঁর নিকট ভাষা শিক্ষা করার জন্য ভিড় জমাতেন। তিনি অতি অল্প সময়ে অতি সুন্দর পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতেন এবং তা অতি সহজেই শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে গ্রোথিত হতো।

এছাড়াও তিনি রেডিও বাংলাদেশে আরবী প্রোগ্রামার হিসেবে যোগদান করেন। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার জাতীয় চাহিদার ভিত্তিতে রেডিও বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্ব কার্যক্রমে আরবী ভাষা শিক্ষার প্রকল্প হাতে নেন। ঐ ধারাতেই আযহারীকে আরবী প্রোগ্রামের পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তাঁরই পরিচালনায় আরবী প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিচিতি দ্রুত বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় যা ছিল কল্পনা আযহারী সাহেবের প্রচেষ্টায় তা বাস্তবে রূপ নেয়।

আযহারী সাহেব আরবী ভাষা ছাড়াও ইসলামের নানা বিষয়ের ওপর প্রোগ্রাম করতেন। তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্রে "পথ ও পাথেয়" অনুষ্ঠানে তিনি একজন নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। কুরআন হাকীম ও আমাদের জিন্দেগী কথিকামালা ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত হয়। আপামর জনসাধারণ শত চেষ্টা চালিয়েও যেসব সমস্যার সমাধান করতে পারতেন না তা তাঁর আলোচনার মাধ্যমে এমনিতে পেয়ে যেতেন।

দ্বিতীয় : দা'য়ী ইলাল্লাহ হিসেবে আযহারীর মূল্যায়ন

সার্বিক দিক থেকে আযহারী সাহেব ছিলেন একজন সফল দা'য়ী ইলাল্লাহ ও অনলবর্ষী বক্তা। যুগ-জিজ্ঞাসার আলোকে সাবলীল ভাষায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করতেন। ফলে যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই মানুষের ঢল নামত। বিশেষ করে তাঁর তাফসীরুল কুরআনের মাহফিলে অগণিত মানুষের সমাগম হত।

তাঁর ওয়াজ শুনে অনেক অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তিনি স্বাভাবিকভাবে সমগ্র বিষয়ের ওপর এমনভাবে আলোচনা পেশ করতেন তার মর্ম শ্রোতার হৃদয়ে গ্রোথিত হতো। এসব ধর্মীয় ওয়াজ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা ও সাংগঠনিক প্রোগ্রামে যে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা রাখতেন তা উপস্থিত সকলকে উদ্বেলিত করতো।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে যখন ইসলামী আন্দোলনের উপর খড়ক নেমে আসে তখন তিনি মসজিদ মিশন গড়ার মাধ্যমে সংগঠনের মূল ধারা ঠিক রাখেন। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় যে, আযহারী সাহেব তখন যদি ঝুঁকি নিয়ে ইসলামের এ খেদমত না করতেন তাহলে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস ভিন্ন রূপ হতো। তথা আজকে এ পর্যায়ে উপনীত হতে পারতো না বলে অনেকেই মনে করেন।

মাওলানা আযহারীর জীবনের কিছু বিশেষ দিক

মাওলানা আলাউদ্দিন আযহারী ছিলেন বহু গুণে গুণান্বিত এক মহান ব্যক্তি। ধর্মীয় শিক্ষা ও আধুনিকতার এক উজ্জ্বল সমন্বয় ঘটিয়েছেন তিনি। দীর্ঘদেহী এই পুরুষটি চাল-চলন ও কথা-বার্তায় ছিলেন অত্যন্ত পরিমার্জিত ও পরিশীলিত। তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতবান ও সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব। পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন পরিপাটি। আলাপচারিতায় রসিকতাও করতেন আযহারী সাহেব।

মাওলানা আযহারী ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি বহু দেশ সফর করেছেন এবং বহু প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সংগে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ-লিবিয়া ভ্রাতৃ সমিতির সভাপতি, বাংলাদেশ আরব জাহান মৈত্রী সমিতির সাধারণ সম্পাদক, রাবেতায়ে আলম ইসলামী'র সদস্য, মজলিসুস সাকাফাহর প্রতিষ্ঠাতা এবং এর মাসিক আরবী মুখপত্র 'আস সাকাফাহর' সম্পাদক, ৮১ নং মতিঝিলস্থ সাবেক আরবী একাডেমী রেক্টর এবং বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখে গেছেন। তিনি অতিথি পরায়ণ ছিলেন। তিনি একদিকে ছিলেন সদালোপী ও মিষ্ট ভাষী অন্যদিকে ইসলামী অনুশাসন পালনের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। আযহারী সাহেব বিপদে-আপদে অনেককেই সহায় করেছেন। ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ এনামুল হককে তিনি তাঁর বাসায় আশ্রয় দিয়েছিলন।

মাওলানা আযহারী ছিলেন এক তেজস্বী, নির্ভীক ও দৃঢ়চেতা বক্তা। তিনি সরকারি চাকুরী করেও ইসলামের ব্যাপারে ছিলেন সত্যভাষী, স্পষ্টবাদী ও আপোষহীন। এ কারণে তিনি সরকারের রসানলেও পরেছিলেন এবং তাঁকে ঢাকার বাইরে বদলী করা হয়েছিল। তিনি এই অন্যায় বদলীর বিরুদ্ধে কোর্টে

মামলা করে জয়ী হন। মামলায় যুক্তি দেখানো হয় যে, তিনি লেকচারার ইন মডার্ণ অ্যারাবীক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন এবং ঢাকা আলীয়া মাদরাসা ছাড়া অন্য কোথাও মডার্ণ অ্যারাবীক নেই। সুতরাং অন্য কোথায় তাঁকে বদলী করা যাবে না।

তিনি প্রায় দীর্ঘ দশ বছর মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানাধীন কয়ারিয়া ঈদগাহ জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে প্রতি রমজান মাসে কুরআনের তাফসীর করতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আমরা যাতে কুরআন শরীফের সূরার অর্থ ও মর্ম বুঝতে পারি। তাঁর তাফসির শুনে উপস্থিত মুসল্লিগণ মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাঁর তাফসিরের বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি যেদিন যে সূরার তাফসির করবেন উহা প্রথমে তেলাওয়াত করতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত মধুর। সূরা পাঠ করার পর উহার শানে নুজুল বর্ণনা করতেন এবং তারপর বিজ্ঞানের আলোকে এবং যুক্তির মাধ্যমে প্রতিটি শব্দের ও বাক্যের গূঢ়ার্থ ও মর্মার্থ ব্যাখ্যা করতেন এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী ও ইতিহাস বর্ণনা করতেন। তিনি আল্লাহর সংগে বান্দার সরাসরি সম্পর্কের উপর জোর দিতেন, কোনো মানুষের মাধ্যমে নহে। এ ছাড়া তিনি আল্লাহর উপর সর্বদা ভরসা করতে বলতেন, মানুষের উপর নহে এবং অন্যের কাছে দোয়া না চেয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে বলতেন। তিনি বহু বছর কয়ারিয়া ঈদগাহ জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাজে ইমামতি করেছেন।

মাওলানা আযহারী ছিলেন মুক্ত চিন্তার অধিকারী। ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে তিনি তাঁর চিন্তা-চেতনা অকুতোভয়ে প্রকাশ করতেন।

শিক্ষার প্রসার ও প্রচারে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে মরণোত্তর ইসলামী ফাউন্ডেশন পদক দেয়া হয়। মৃত্যুর পূর্বে ঢাকাস্থ তৎকালীন লিবিয়ার রাষ্ট্রদূত গাদামসী তাঁকে হাতপাতালে দেখতে আসলে তিনি তাঁর মাধ্যমে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মোয়াম্মার গাদ্দাফীকে মুসলিম বিশ্বে একটা বার্তা ছড়িয়ে দিতে অনুরোধ জানান। আর তা হলো দুনিয়ার মুসলমানরা যেনো একতাবদ্ধ থাকে। এ থেকেই প্রমানিত হয় যে মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর কতো দরদ ছিল। একটা কথা আছে– গল্পের মতো জীবন ছোট, না বড় তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো তা ভাল কিনা? আযহারী সাহেবের বিশাল কর্মকান্ডের বিবেচনায় তাঁর স্বল্প জীবন অত্যন্ত সফল ও সার্থক।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁর অবদান

আজকে বাংলাদেশে ইসলামের যতটুকু কাজ ও সাংগঠনিক তৎপরতা দেখা যায় তার অধিকাংশের মূলেই রয়েছে আযহারী সাহেবের প্রচেষ্টা। এমন কোনো

ক্ষেত্র নেই যেখানে ইসলামের সামান্যতম একটু খেদমত হবে তাতে তিনি অংশগ্রহণ করেনি। তাই তিনি বিভিন্ন আঙ্গিকে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের মাঝে ইসলামী ভাবধারা বিস্তার করতে সক্ষম হন। তার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

১. মসজিদ মিশনের প্রতিষ্ঠা

মূলত মসজিদই হলো ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। আযহারী সাহেব বুঝেছিলেন যে, মসজিদগুলোর মাঝে যদি রূহানিয়াত ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য।

মসজিদে নববীর আলোকে বাংলাদেশের মসজিদগুলো গড়ার জন্য তিনি মসজিদ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন শিক্ষিত, তাই শিক্ষিত মানুষের মাঝে ইসলামের মর্মবাণী প্রচারের নিমিত্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর-পশ্চিম কর্ণারে কাঁটাবনে এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ইহা সরকার অনুমোদিত একটি দেশীয় ইসলামিক এনজিও রূপে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

২. বাংলাদেশ-লিবিয়া ভ্রাতৃ সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্তি

মুমিনরা সকলে ভাই ভাই, এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনই ইসলামের মূল শক্তি। ঔপনিবেশিক আমল থেকে বিভিন্ন দেশ-বিদেশের মাঝে যে বিবাদের সূত্রপাত হয় তা কমিয়ে আনার জন্য আযহারী সাহেব বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেন।

মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। তৎকালীন লিবিয়ার রাষ্ট্রদূত আহমদ মাগাদেশী তাঁর পরিকল্পনার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করলে তিনি ১৯৭৪ সালে ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ-লিবিয়া ভ্রাতৃ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

এই সমিতির মাধ্যমে তৎকালীন সময়ে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়। সাথে সাথে মুয়াম্মার গাদ্দাফীর সবুজ বিপ্লবের কার্যক্রমও চালানো হয়। এর ফলে আযহারী সাহেব আরবী ভাষায় অনেকগুলো পুস্তক রচনা করেন। সেগুলো সমিতির মাধ্যমে ছাপিয়ে দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। অবশ্য আযহারী সাহেবের মৃত্যুর পরে ঐ সমিতি অদ্যাবধি টিকে থাকলেও সেই কর্মচঞ্চলতা আর নেই। যদিও ঐ সমিতির বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল আযহারী সাহেবের ভাগ্নীজামাই মাওলানা মুজিবর রহমান কিছু কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবুও বিভিন্ন কারণে উহা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ-আরব জাহান মৈত্রী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও রাবেতা আলম আল ইসলামীর সদস্য ছিলেন।

৩. বাংলাদেশ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিষদ গঠন

সাহিত্য-সংস্কৃতি মানব জীবনের অতীব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা মানুষকে তার সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে অনেক সহায়তা করে। নির্ভেজাল সংস্কৃতি আদর্শ জাতি গঠনের অন্যতম বিষয়। স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গন বিশেষ সংস্কৃতির আগ্রাসনের শিকার হয়। ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিবর্তে ধর্ম নিরপেক্ষতার সুযোগে ধর্মহীনতাকরণের কাজ ব্যাপকভাবে চালু হয়। এমনকি ইসলাম ও মুসলমান শব্দ দু'টি অনেকের গা জ্বালার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই উহা উচ্ছেদের জন্য তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে 'মুসলিম' শব্দ ও কাজী নজরুল ইসলাম কলেজ থেকে 'ইসলাম' শব্দ বাদ দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কুরআনের আয়াত "ইকরাবিসমি রাব্বিকাল্লাযি খালাক" তুলে দেয়া হয়। এমন নজির পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

আযহারী সাহেব এই ব্যাপারটি ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। তাই তিনি বাংলার মানুষের মন ও মানসিকতার দিকে লক্ষ্য করে ১৯৭৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ইসলামী সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিষদ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

শত শহীদের রক্তে ভেজা বাংলাদেশে ঈমান ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই সংগঠন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় অতি সন্তর্পণে ঢুকে যাওয়া সংস্কৃত পরিভাষাগুলো বাদ দিয়ে ইসলামী পরিভাষার প্রচলন করেন। খাঁটি বাংলা প্রচলনের নামে বাংলা ভাষা থেকে আরবী ও ইসলামী শব্দ বাদ দিয়ে সংস্কৃত শব্দ সংযোজনের বিরোধিতা করেন।

এ সংস্থা বিভিন্ন ফলপ্রসূ কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং আস সাকাফাহ (সাংস্কৃতিক) নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। তাছাড়াও বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী সকলকে পুরস্কৃত করা হতো। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেই ইসলামী সাহিত্য রচনা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

এই পরিষদ আরবী ও ইসলামী শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন কার্যকরী ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করত।

এই সংস্থারই সাথে জড়িত লোকেরা আজকে দেশে ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত। আজকে আমরা এদেশে যতটুকু ইসলামী সাহিত্য চর্চা দেখি তার সূচনা মূলত ঐ স্থান থেকে শুরু হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। বর্তমানেও বিভিন্ন ইসলামী সাংস্কৃতিক সংগঠন ইহাকে অন্যরূপ নাম দিয়ে একই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে দেশে আজ ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার উপকরণ ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। ইচ্ছা করলেই যেকোনো লোক ইহা গ্রহণ করতে সক্ষম।

৪. ইসলামী শিক্ষা সংস্কার

ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশ তিনদিক থেকেই হিন্দু প্রধানরাষ্ট্র ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিজাতীয় সংস্কৃতি এদেশের সংস্কৃতিতে বিরাট প্রভাব ফেলে। যুগ যুগ ধরে ইংরেজ শাসনামল থেকে হিন্দুরা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে মুসলমান থেকে একধাপ এগিয়ে থাকে। তখন সরকারি জনবল কাঠামোতে কোনো ধর্মীয় শিক্ষকের পদ না থাকলেও পণ্ডিত পদে কয়েকজনের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর পণ্ডিত বলতেই হিন্দু। তারা কোনোক্রমেই মুসলমানদের একটু স্বার্থ রক্ষা হয় এমন কোনো কাজ ভুলেও করত না। বাংলা সংস্কৃতির নামে তারা সুকৌশলে মুসলমান ছেলেদেরকে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে দূরে রাখতে চাইতেন। ফলে এসব ছেলেরা ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ে। এমন কি এ ধারা তৎকালীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। বিশেষ করে বেসরকারি মাদরাসাতেও জাতীয় স্কুল বোর্ডের বই পড়ানো হতো। আযহারী সাহেব এর বিষফল সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন বলে প্রথমেই ইসলামী শিক্ষা শুদ্ধি অভিযান শুরু করেন। আসলেই তিনি মনে মনে চেয়েছিলেন সমাজে যদি স্বল্প পরিসরে হলেও ইসলামী শিক্ষার একটি আদর্শ নমুনা প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে সচেতন মানুষ দ্রুত এর দিকে ফিরে আসবে। তাই তিনি বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপের মাধ্যমে এই শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করেন। অল্পদিনের মাঝেই জাতি এর সুফল পেতে শুরু করে। পরিশেষে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মাদরাসা শিক্ষার জন্য আলাদা কারিকুলাম তৈরি হয় এবং আলাদা বই রচিত হয়। পরিশেষে সরকার একে মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়। ফলে মাদরাসা শিক্ষিতরা আজ কোন ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। বরং এক ধাপ এগিয়ে।

৫ সাংস্কৃতিক ও মননশীল পত্রিকা প্রকাশ

পত্রিকা হলো ভ্রাম্যমাণ বিশ্ববিদ্যালয়। ইহা সমাজের দর্পণ, ইহা দৈনন্দিন তরতাজা তথ্যগুলোকে মানুষের সামনে এমনভাবে পেশ করে যে, অল্প সময়ের মাঝেই তার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে যায়। আমাদের সমাজ গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা অনন্য। তাই ইসলামী সমাজের স্বপ্নদ্রষ্টা আলাউদ্দীন আল-আযহারী সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে আরবী পত্রিকা ও ম্যাগাজিন প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন।

আরো একটু গভীরভাবে নজর দিলে দেখা যায় যে তিনি একদল ইসলামী কলম-সৈনিক তৈরি করার নিমিত্তে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্রদেরকে তিনি পত্রিকা ও ম্যাগাজিন পড়তে ও প্রকাশ করতে উৎসাহিত করতেন ও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতেন। তিনি তৎকালীন সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ সমস্ত কাজ করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের মাঝে অন্যতম ছিল আস সাকাফা নামক মাসিক আরবী পত্রিকা।

স্বাধীনতার পরপরই যখন এদেশে ইসলামী সংগঠন কার্যক্রম প্রায় নিষিদ্ধ তখন ১৯৭২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মাজলিমুম সাকাফার লক্ষ্যে তিনি এই পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। এবং ১৯৭৮ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এর প্রকাশনা অব্যাহত ছিল। আরবী ভাষায় প্রকাশিত ৩২ পৃষ্ঠার ক্রাউন সাইজের এই পত্রিকাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মাসের শুরুতেই প্রকাশিত হতো। পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যেতো যে, ইহা একটি ইসলামী সাহিত্য বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলছে। পত্রিকাটি মসজিদ মিশন বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে আযহারী সাহেবের বাসা ১১৮, কাজী অফিস, মগবাজার থেকে প্রকাশিত হতো। আর তা মুহাম্মদ মনিরুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে ৬৩ নং ঋষিকেশ দাশ লেন, ঢাকা-১ এর জাহানারা ফাইন আর্ট প্রেসে মুদ্রিত হতো।

আমাদের সামনে উক্ত পত্রিকার অনেক কপি থাকলেও এর সার্বিক মূল্যায়নের জন্য ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মোতাবেক ১৩৯৫ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসের সংখ্যা নির্বাচন করি। পত্রিকাটির বিষয়সূচি দেখলে মনে হয় যে, ইহা তৎকালীন সময়ে মাদরাসার উন্নয়ন ও ইসলামের জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ রেখেছে। আরবী ভাষা হওয়ার কারণে তা আরব জাহান ও বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের পরিচিতি তুলে ধরতে বেশ সহায়ক হয়েচে এবং ঢাকাস্থ আরব দেশের দূতাবাসসমূহে ব্যাপকভাবে তা সমাদৃত হয়। সারা বাংলাদেশ জুড়ে এই

পত্রিকার গ্রাহক ও সুধীবৃন্দ ছিল। তদ্রূপভাবে দেশের বাইরেও অনেক গ্রাহক ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। যারা বিভিন্নভাবে এই পত্রিকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন তারা হলেন ঃ

১. আব্দুল বাকী, ইমাম, জামে মসজিদ, ১১৮, বড় মগবাজার, ঢাকা।
২. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ, ছাত্রাবাস, মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।
৩. অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৪. মাওলানা আবুল ফারাহ মুহাম্মদ আব্দুল ফাতাহ, পেশ ইমাম, ছাত্রাবাস, শেরেবাংলা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মসজিদ, রমনা, ঢাকা।
৫. ড. মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযম, পোস্ট বক্স নং ২৫৬৩, ত্রিপলি, লিবিয়া।
৬. শাইখ মুহাম্মদ আফতাব উদ্দীন আহমদ, ৪৯নং রেড সাইড মিনিস্টারি গেট, কায়রো, মিশর।
৭. মাওলানা আবুল কাসেম, মিসফালাহ মক্কা শরীফ, সৌদি আরব।
৮. ড. মুহাম্মদ জামান, ১৫ শিলিবিনদানা, লিবিনাসলামি ম্যানসেস্টার, এম-১৯, ৩, এল এফ আমেরিকা।
৯. মুহাম্মদ রাহাতুল্লাহ, শিক্ষক, আরবী বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।

এই পত্রিকার উপদেষ্টা পরিষদ ছিল তিন সদস্যবিশিষ্ট। তাঁরা হলেন ঃ

১. আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড।
২. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক।
৩. ড. মুহাম্মদ ইসহাক, চেয়ারম্যান, আরবী ও ইসলামী স্টাডিস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উল্লেখ যে, ড. মুহাম্মদ ইসহাকের রচিত উসূলে হাদীস বিষয়ে আরবী কিতাবখানি লেবালনের বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়। যা বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক ও প্রামাণ্য এবং রেফারেন্স পুস্তক হিসেবে বিবেচিত।

উক্ত আস সাকাফা পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে খবর ছাপা হলেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়মিত প্রকাশিত হতো : (১) সম্পাদকীয় (২) ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান (৩) শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ (৪) সোনার বাংলা (৫) আদর্শ অনুবাদ (৬) বিভিন্ন বিষয়ক সংবাদ (৭) মসজিদ মিশনের সংবাদ (৮) আধুনিক আরবী সাহিত্যের পাতা থেকে (৯) প্রাচীন আরবী সাহিত্যের পাতা থেকে (১০) আরবী ভাষা শিক্ষা

(১১) বাংলা ভাষা শিক্ষা (১২) বাংলা সাহিত্য অঙ্গন (১৩) চিঠিপত্র (১৪) ইতিহাস-ঐতিহ্য (১৫) ছাত্র ও শিক্ষকের আসর (১৬) পত্র মিতালী।

৬. মাসিক মুসলিম মহিলা পত্রিকা

সমাজের অর্ধেক লোক নারী, তাদের মাঝে ইসলামী শিক্ষার অভাব প্রকট। ইসলামী সাংস্কৃতিক চর্চা প্রায় অনুপস্থিত। পেপার-পত্রিকা পড়াকে তারা হারাম মনে করতো। উহার কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকা ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। আযহারী সাহেব এর করুণ পরিণতি সম্যকভাবে অবগত ছিলেন। তাই তিনি নারী সমাজের মাঝে ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যেহেতু মা-ই সন্তানের প্রথম ও আদর্শ শিক্ষাদাতা তাই ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যমে তাঁদের মননশীলতা বিকাশে তাদেরকে যথার্থ জাতি গঠনের যোগ্যতম করে পড়ার মানসে মাসিক মুসলিম মহিলা নামে ৬৪ পৃষ্ঠার রয়্যাল সাইজের একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি নারী সমাজের বিভিন্ন রকম সমস্যা, সম্ভাবনা ও ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং যুগোপযোগী নানা বিষয় নিয়ে নিয়মিত প্রকাশ করেন। এবং ইহা সরকারের নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। অল্পদিনের মাঝেই ইহা পাঠক সমাজে বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। অবশ্য আযহারী সাহেবের মৃত্যুর পরে ইহার প্রকাশনা আর বেশি দিন চলতে পারেনি। তবে বাস্তব অবস্থা এই যে, বর্তমানে মহিলাদের জন্য বাংলায় যে কয়েকটি পত্রিকা এদেশে প্রকাশিত হচ্ছে তার সূত্রপাত কিন্তু ঐ পত্রিকার মাধ্যমেই হয়েছে। আর যারা ইহা প্রকাশ করেছে তারা আযহারী সাহেবের চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক হিসেবে পরিচিত।

৭. রেডিও বাংলাদেশে আরবী অনুষ্ঠানের প্রচলন

জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত। তিনদিক থেকে দেশটি একটি হিন্দু অধ্যুষিত রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি এখানে ব্যাপক প্রসার লাভ করলেও আরবী ও ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা উল্লেখ করার মতো নয়। আরবী চর্চার নামে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালের মাঝে যতটুকু পড়ানো হয় তাই। জাতীয়ভাবে আরবী চর্চার তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ক্ষুদ্র এদেশটি আরব জাহানের সাথে প্রায় গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আলাউদ্দীন আল আযহারী এ বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি রেডিও-তে আরবী ভাষা শিক্ষার একটি প্রস্তাব করেন। পূর্ব থেকে যেহেতু তিনি রেডিও'র আভ্যন্তরীণ সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন তাই কর্মকর্তারা তাঁর প্রস্তাবে

সম্মতি দিয়ে তাঁরই পরিচালনায় সকাল ১১.১৫ মিনিট থেকে আধা ঘণ্টার আরবী শিক্ষার একটি অনুষ্ঠান চালু করে। তিনি উক্ত অনুষ্ঠানে আপামর জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দাবলী ও উহার ব্যবহার সাবলীলভাবে বুঝিয়ে দেন। ফলে বাংলা ভাষাভাষী আরবী শিক্ষার্থীরা এতে প্রচুর উপকৃত হয়। এ অনুষ্ঠানটিতে আরব বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের আদলেই রাত্র ১০টায় আবার বহির্বিশ্ব কার্যক্রমে বঙ্গবুন্ধ শেখ মুজিবুর রহমানের আদেশে ১৯৭৫ সাল থেকে আর একটি আরবী অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। যার প্রচারণা আজও বিদ্যমান। উভয় অনুষ্ঠানেই বিষয়াবলী একটু ভিন্ন থাকলেও–

ক) পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত
খ) সংবাদ পাঠ
গ) সংবাদ পর্যালোচনা
ঘ) সংবাদ শিরোনাম
ঙ) চিঠিপত্রের জবাব
চ) বিশেষ প্রবন্ধ ও
ছ) আরবী গান ও বাংলা গান, ইত্যাদি সমভাবে প্রচারিত হয়।

এ অনুষ্ঠানটি আরব জাহানে ব্যাপক সমাদৃত হয়। সৌদি আরবের জেদ্দাস্থ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী উক্ত অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হয়ে আলাউদ্দীন আল আযহারীর কাছে প্রশংসাপত্র প্রেরণ করেন। আলাউদ্দীন আল আযহারী উক্ত অনুষ্ঠানকে এতো গুরুত্ব দিতেন যে, মৃত্যু শয্যায় হাসপাতালের বিছানায় শুয়েও এ অনুষ্ঠান শুনতেন ও এর তদারকি করতেন। ভুলভ্রান্তি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে উহা শুধরে দিতেন। অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর সংবাদ রেডিও-তে প্রকাশ করা পর্যন্ত তিনি রেডিও'র সাথে যুক্ত ছিলেন।

তাঁর এই সংযুক্তি তাঁকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচিতি লাভে ব্যাপকভাবে সহায়ক হয়।

৮. বাংলা ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়ন

বিশ্বকোষ একটি জাতির জ্ঞানভাণ্ডার, উহার মাধ্যমেই জাতীয়ভাবে জ্ঞান চর্চার পরিমাপ করা হয়। স্বাধীনতার পূর্বে এদেশে কোনো বিশ্বকোষ না থাকলেও স্বাধীনতার পর পরই বাংলা বিশ্বকোষ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কিন্তু উহাতে অদৃশ্য কারণে ইসলামী বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি না থাকায় উহা জাতির

আকাঙ্ক্ষা পূরণে মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আঁচ করতে পেরে উহাতে ইসলামী বিষয়াবলী সংযোজনের সিদ্ধান্ত নেন। এজন্যে একটি কমিটি গঠন করা হয় যার প্রধান ছিলেন আযহারী সাহেব নিজে।

তিনি তৎকালীন সময়ের খ্যাতনামা আলেম, সাংবাদিক ও লেখকদের নিয়ে উক্ত বিষয়টিকে সকলের নিকট হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন। সংগ্রাম পত্রিকার সিনিয়র সহকারী সম্পাদক মুহাম্মদ সাজজাদুল হকও এই কমিটির সদস্য ছিলেন। তারা বিশ্বে প্রচারিত ও বিভিন্ন প্রামাণ্য তথ্যসূত্র থেকে বিষয়ভিত্তিক লেখা তৈরি করেন। পরবর্তীকালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে যে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয় তা আযহারী সাহেবের চিন্তারই পরিপূর্ণ রূপ। বলা বাহুল্য যে, এই ইসলামী বিশ্বকোষের মাধ্যমে সমাজের উচ্চপদস্থ লোকেরা ইসলামের সাথে পরিচিত হবার ব্যাপক সুযোগ পায়। যা পরবর্তীকালে ইসলামী সমাজ গঠনে বেশ সহায়ক হয়।

বিরূপ পরিবেশে আরবী ভাষা প্রসারে তাঁর প্রচেষ্টা

মূলত আযহারী সাহেবের জীবনটাই ছিল আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারে উৎসর্গীত। যেহেতু তিনি ভালোভাবেই এদেশের ভৌগলিক, সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়াবলী সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই তিনি কোনো রক্তচক্ষুকে ভয় না করে জালিমের জুলুম ও শাসকবর্গের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করেই তাঁর মিশন বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ভালোভাবে বুঝেছিলেন যে, ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছাড়া এ ভূখণ্ডে জনগণের মুক্তি নাই। সত্যিকারভাবে শিক্ষাব্যবস্থাই এদের মুক্তির সনদ। তৎকালীন শাসক বিভিন্ন অজুহাতে যখন দেশের মাদরাসাগুলোকে একটির পর একটি বন্ধ করে দেয়। নামকরা ওলামায়ে কেরামদেরকে মিথ্যা অভিযোগে যখন পাইকারীভাবে হত্যা করা হয় তখনও আল-আযহারী এ শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যাপক কাজ করেন। মাদরাসা শিক্ষার ঐ দুর্দিনে আযহারী সাহেব, মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ ও মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমানসহ পাঁচজন আলেমকে সাথে নিয়ে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে যান ও মাদরাসা শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা করেন। পূর্বের প্রচারিত সকল অভিযোগকে খণ্ডন করে দেশ গঠনে মাদরাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু সকল বন্ধ করা মাদরাসা খুলে দেয়ার সরকারি আদেশ জারি করেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক অবদান মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে থাকবে।

শুরু হয়ে যায় নতুন উদ্যমে মাদরাসা গড়ার কাজ। মাদরাসাগুলোতে আবার গুঞ্জরিত হয় আল্লাহর অমীয় বাণী। দেশ এক মারাত্মক ভয়াবহ পরিণতি থেকে মুক্তি পায়। উল্লেখ্য, আযহারী সাহেব তখন যদি এই পদক্ষেপ গ্রহণ না করতেন তাহলে মাদরাসা শিক্ষার ভাগ্যে কি ছিল তা আল্লাহই ভালো জানেন।

জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে তাঁর বইয়ের অন্তর্ভুক্তি

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি জাতিকে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেয়া অতীব জরুরি। আযহারী সাহেব উক্ত উপকরণ প্রস্তুতিতে ছিলেন সদা তৎপর। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি পুস্তক প্রণয়নের কাজ চালিয়ে যান। তাঁর প্রণীত পুস্তকগুলো সার্বিক বিচারে মানসম্পন্ন হওয়ায় উহা জাতীয় পাঠ্যপুস্তক কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত হয়। এর মধ্যে ইসলামীয়াত অন্যতম ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ডিগ্রী পর্যন্ত তাঁর পুস্তক পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের বিভিন্ন ক্লাসে তার রচিত বই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তিনি যেসব পুস্তক রচনা করেন বর্তমানে উহা রেফারেন্স মূলক হিসেবে বিবেচ্য এবং বর্তমান সময়ে যেসব পুস্তক তালিকাভুক্ত রয়েছে তার মধ্যে আযহারী সাহেবের অনুকরণ স্পষ্ট। তিনি এ পুস্তক রচনার মাধ্যমে এদেশে ইসলামী শিক্ষার যে ভিত স্থাপন করেছেন তার উপরে রচিত হয়েছে আজকের ইসলামী সাহিত্য বিপ্লব। বাস্তবিকভাবে তিনি সুদূরপ্রসারী চিন্তাশক্তির অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি সৌদী আরব, মিশর, লিবিয়া, ইরাক, সিরিয়া, জর্দান, আরব আমিরাত সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের আরো অনেক দেশ সফর করেন। উল্লেখ্য যে তিনি ১৯৭৬ সনের শেষের দিকে সোভিয়েত রাশিয়ার তাশখন্দে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মুসলিম শান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে যোগদান করেন ও লেলিনগ্রাডের চাবি উপহার লাভ করেন।

অসুস্থতা ও মৃত্যু

প্রকৃতির ধারামতে আস্তে আস্তে আযহারী সাহেব বেড়ে উঠেন। কর্মপ্রিয় মানুষটি অবসরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কাজের চাপে শরীরের প্রতি বিশ্রাম নেয়াও ভুলে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেও মনের শক্তির কারণে তিনি এগুলোকে মোটেও আমল দেননি। দীর্ঘদিন খাদ্য গ্রহণে অনিয়ম ও শীত গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে শক্তির চাইতে বেশি পরিশ্রম করায় তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর পাকস্থলী থেকে রক্তক্ষরণ রোগ ধরা পড়ে। তিনি ঢাকা মেডিকেল

কলেজের প্রফেসর মনিরউদ্দীনের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। কিছুটা সুস্থ হলে ডাক্তারের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল কথা বলা ও হাঁটাচলা থেকে। কিন্তু আযহারী সাহেব এসব কিছুর তোয়াক্কা না করেই বিরামহীনভাবে তাঁর কাজ করতে ছিলেন। ফলে তাঁর শরীরের অবস্থার মারাত্মক অবনতি হয়। এ সময় তাঁকে পিজি হাসপাতালের ১৩৬ নং কেবিনে ভর্তি করা হয়। তাঁর রক্তক্ষরণ চলতেই থাকে। কোন অবস্থাতেই তা ভালো হচ্ছিল না। ডাঃ নূরুল ইসলাম ও ডাঃ মনিরুজ্জামানকে নিয়ে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হলে বোর্ড অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেয়। অপারেশনে তাঁর অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। অপারেশনের পরে তিনি মাত্র ৭ দিন বেঁচে ছিলেন। হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ে মূলত প্রকাশ পেয়েছে যে আযহারী সাহেব কতো বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সারাক্ষণ অগণিত মানুষ তাকে এক নজর দেখার জন্য ভিড় করতেন। উল্লেখ্য যে, পিজি হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন, এক পর্যায়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার কথা তুলে ধরেন, বাস্তবে তিনিই সে পিজি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। সৌদী রাষ্ট্রদূত তাকে আমেরিকায় চিকিৎসার প্রস্তাব করলেও বাস্তব অবস্থা নাজুক থাকায় তা আর হয়ে উঠেনি। বাংলাদেশের এ উজ্জ্বল নক্ষত্রটি অনেকটা অভিমান করেই চলে গেলেন প্রভুর সান্নিধ্যে। অবশেষে ১৯৭৮ সনের ২৭শে মার্চ সকাল ৭ ঘটিকার সময় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও ছাত্ররা তাঁকে ঢাকার কাজী অফিস লেনস্থ বাসায় নিয়ে আসেন এবং গোসল করান। বায়তুল মোকাররম মসজিদে তাঁর ওস্তাদ অলিয়ে কামেল ও ঢাকা আলিয়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা সুলতান আহমদ তাঁর জানাজা নামাজের ইমামতি করেন।

উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক গোলাম আযম (যিনি সম্পর্কে আযহারী সাহেবের স্ত্রীর ভাই) তখন কুয়েত ছিলেন। তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ এ. বি. মাহমুদ হোসেন গোলাম আযমের কাছে তাঁর দাফনের স্থান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন– আযহারী মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আব্বার খেদমত করেছেন। তিনি ছেলের মতো ভূমিকা পালন করেছেন এবং ঢাকার মগবাজার কাজী অফিস লেনস্থ মসজিদের প্রথম অবৈতনিক ও নিয়মিত খতীব ছিলেন। তাই মসজিদের পাশেই তিনি তাঁকে দাফন করতে বললেন। সে অনুযায়ী তাঁকে মসজিদের দোতলার সিঁড়ির পাশে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন।

কূটনীতিক, বিশিষ্টজন ও সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টিতে

তিনি নিজেও প্রচার মাধ্যম তথা সংবাদপত্র রেডিও-টিভির সাথে জড়িত ছিলেন। তাই মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ল। সাথে সাথে সারা দেশে শোকের কালো ছায়া নেমে আসে। তাঁকে মানুষ যে এতো ভালোবাসত, তা তাঁর জানাজার নামাজের উপস্থিতি থেকে বুঝা যায়। তৎকালীন বাংলাদেশস্থ সৌদি রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল-খতীব রীতিমত হাসপাতালে তাঁর খোঁজখবর রাখতেন এবং ডাক্তারদের সাথে আলাপ করতেন। তাঁর স্ত্রী ও শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য মাঝে মাঝে তাঁর বাসায় আসতেন। মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে বাংলাদেশস্থ তৎকালীন লিবিয়ার রাষ্ট্রদূত আলী হোসাইন আল গাদামসী আসরের সময় হাসপাতালে দেখতে এসে তিনি আযহারীর কপালে হাত রেখে তিনবার বললেন– সামিহ্না ইয়আখ আল আযহারী (হে ভাই আল-আযহারী, আমাদিগকে মাপ করো)। অর্থাৎ আমরা তোমার মর্যাদা নিরূপণ করতে সক্ষম হয়নি। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ এনামুল হক আযহারীকে দেখার জন্য প্রতিদিন হাসপাতালে যেতেন। কিন্তু বার্ধক্যের কারণে উপরে উঠতে পারতেন না, সিঁড়ির কাছে বসেই আযহারীর খোঁজখবর নিতেন। তাঁকে যখন বলা হতো আপনি তো বাসায় বসে খবর নিতে পারতেন এতো কষ্ট করার কি দরকার ছিল। তখন তিনি বলতেন আযহারী আমাদের ও দেশের জন্য যা করেছেন আমরা তাঁর জন্য কিছুই করতে পারিনি। হয়তোবা তিনি যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাঁকে তার বাড়ির দোলায় আশ্রয় দিয়ে যে উপকার করেছেন তাঁর এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।

তাঁর মৃত্যুতে সংবাদপত্র বেশ গুরুত্বের সাথে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিক ব্যাপকভাবে প্রচার করে। বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন সভা, সমিতি, সেমিনার ও দোয়া মাহফিল এবং স্মৃতিচারণ সভার মাধ্যমে তাঁকে আরেকবার মূল্যায়ন করে, বর্তমান প্রজন্মের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয় নিজেদের স্বার্থে সে ধারা কম করে হলেও আজও বিদ্যমান। এভাবে আযহারী ইতিহাসের পাতায় নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

পুণ্যবতী মায়ের অলৌকিক আহ্বান

মাওলানা আলাউদ্দিন আল আযহারীর পিতা ছিলেন ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন দ্বীনদার লোক এবং তাঁর মাতাও ছিলেন পুণ্যবতী মহিলা। পিতা ইসলামী জ্ঞান বিতরণ করতেন পুরুষ মহলে। মাতা ইসলামী মৌলিক জ্ঞান যথা, সহীভাবে কোরআন মজীদ শিক্ষা, উর্দু ভাষায় মাসাইল-এর কিতাব পড়ানোর খেদমত

করতেন মহিলা অঙ্গনে। যার কারণে বাড়ীর সব মহিলাদের কাছে তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধাভাজন। তিনি ইন্তিকাল করেন গ্রামের বাড়ী সাহেবরামপুর, জিলা মাদারীপুর। ঐ সময় মাওলানা আলাউদ্দিন আল আযহারী সাহেব ছিলেন ঢাকায়। সে জামানায় গ্রামে টেলিফোন এর কোন ব্যবস্থা ছিল না। আযহারী সাহেব ঢাকা স্বপ্ন যোগে দেখেন তাঁর পুণ্যবতী মা একটা ছোট সাঁকো পার হয়ে খালের অপর পাড়ে গিয়ে আযহারী সাহেবকে বলছেন– মাওলানা, আমি পাড় পেয়ে গেছি। অর্থাৎ অপর জগতে চলে গিয়ে নাজাত পেয়েছেন। এই স্বপ্ন দেখে আযহারী সাহেব বুঝতে পারলেন মোহতারমা মা নেই। তাড়াতাড়ি গ্রামের বাড়ীতে চলে এলেন মায়ের বাকী কাজ সম্পন্ন করার জন্য।

মিশরী মাওলানা ঃ কালকিনি থানা ও পাশ্ববর্তী এলাকায় মাওলানা আলাউদ্দিন আল আযহারী সাহেব মিশরী মাওলানা বলে পরিচিত ছিলেন। পবিত্র কয়ারিয়া ঈদগাহ ময়দানে পবিত্র রমজানে কুরআন মজীদের তাফসির করতেন ও ঈদের নামাজের ইমামতি করতেন। দলে দলে লোক বিভিন্ন গ্রাম থেকে মিশরী মাওলানা সাহেব এর তাফসির শোনার জন্য আসতেন। মোল্লারহাট সিনিয়ার মাদরাসা প্রাঙ্গণেও তাফসির করেছেন। আশ্চর্য লাগতো তিনি রোজা রেখে এতো কথা কিভাবে বলতেন? এমনও দেখা গেছে যে কথা বলতে বলতে ঠোঁটের কিনারায় মুখের ফেনা জমা হলে হাত দিয়ে পরিষ্কার করতেন। সূরা ফাতিহার তাফসির বেশীর ভাগ করতেন বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে। কখনো কখনো মিশর এর জামেয়া আযহার এর স্মৃতিচারণ করতেন। জাদুঘরে ফেরআউনের নাম এর আকৃতি বলতেন। পিরামিড এর ভিতরে ঢুকে দেখেন বিশাল আকাশ নক্ষত্র ভরা এবং বিরাট মাঠও যেন তথায় অবস্থান করছে। আসলে ছোট একটি কামড়া ৫/৭ জন দাঁড়াতে পারেন এমন ছিল। কখনো জামেয়া আযহারে নোয়াখালির ছাত্রদের খেজুর গাছ কেটে রস বের করে শিরনী পাকানো ও মিশরের মন্ত্রী আমলাদের বাসায় হাদিয়া দেয়ার গল্প করতেন। পরের বছর ঐ গাছে খেজুর এর ফলন না হওয়ায় ঐ প্রযুক্তি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত নেয়ার কথা বলেছেন আমলাগণ।

বাংলাদেশে আরবী ভাষা প্রসারে তাঁর অবদান

আযহারী সাহেব ছিলেন নানামুখী প্রতিভার এক বিমূর্ত প্রতীক। তিনি আরবী ও ইসলামী শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর ক্ষুদ্র হায়াতে জাতিকে যে দিকনির্দেশনা ও পুস্তক রচনার মাধ্যমে আরবী ও ইসলামী

শিক্ষার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন তা যুগ যুগ পর্যন্ত তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। পূর্বের কোনো উদাহরণ বা কিছু না দেখেই আধুনিক ধারায় আরবী সাহিত্য রচনা করা তাঁর বিরল প্রতিভার পরিচয় বহন করে। তাঁর কার্যাবলীকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে মূল্যায়ন করা যায়।

১. তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী ও পাণ্ডুলিপি।
২. শিক্ষাবিষয়ক সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও পত্রিকা প্রকাশ।
৩. বিরূপ পরিবেশে আরবী ভাষা প্রসারে তাঁর পদক্ষেপ।
৪. অনুবাদক, বক্তা ও শিক্ষক হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন।
৫. আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আযহারীর মূল্যায়ন।

মূল্যায়নের সুবিধার্থে তাঁর রচনাবলীকে চার ভাগে ভাগ করা হলো ঃ

১. ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর রচিত পুস্তকাবলী।
২. অন্যান্য বিষয়ে রচিত তাঁর পুস্তকাবলী।
৩. তাঁর রচনাশৈলী।
৪. তাঁর রচনাবলীর মূল্যায়ন।

আযহারীর রচনাবলী ও পাণ্ডুলিপি

আযহারী সাহেব মূলত একজন খ্যাতনামা লেখক ছিলেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী এদেশে আরবী ও ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধন করেছে। একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, ১৯৫৭ সনে দেশে ফিরে বাংলা একাডেমী ও সরকারি মাদরাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা ও আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ বেতারের আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্ব কার্যক্রমে তাঁর অংশগ্রহণ তাঁর বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৮ মোট ২০ বৎসরের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে তিনি যা রচনা করেছেন, তার মধ্যে যা প্রকাশ হয়েছে তার পরিমাণ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) পৃষ্ঠা আর যা অপ্রকাশিত রয়েছে তার পরিমাণ হবে আরো বেশি। সাথে সাথে তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিটি কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে, ওয়াজ-মাহফিলে তাঁকে উপস্থিত থাকতে হয়েছে। এরই মাঝে এতো মানসম্পন্ন গবেষণামূলক লেখা অভিধান রচনার মতো কাজ

তিনি করে গিয়েছেন। নিজে শত প্রচার বিমুখ হলেও কালের আবর্তে জাতি তাঁর মূল্যায়ন করেছে। তার অনেক পাণ্ডুলিপি আজও অপ্রকাশিত।

নিম্নে তাঁর রচনাবলীর একটি তালিকা পেশ করছি।

১. আরবী-বাংলা অভিধান (বাংলা একাডেমী থেকে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত)।
২. বাংলা-আরবী অভিধান (৫ খণ্ডে লিখিত ও ১ম খণ্ড প্রকাশিত)।
৩. আধুনিক আরবী কথাবার্তা।
৪. সহজ আরবী শিক্ষা (বাংলা ভাষায় আরবী ব্যাকরণ)।
৫. আল-ইনশাউল আছরী (আধুনিক রচনা)।
৬. হাজিহি হিয়া বাংলাদেশ (এইতো বাংলাদেশ)।
৭. ইসলামিয়াত (একাদশ শ্রেণী ও দ্বাদশ শ্রেণী)
৮. তাফসীরে আযহারী (সূরা ফাতিহা প্রকাশিত)।
৯. নীতি ও দুর্নীতি।
১০. অমুসলিমদের জন্য ইসলামী আইনের সূত্র ও নীতিমালা (ইংরেজীতে)
১১. আল-আদাবুল আসরী (ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠ্য)
১২. আল-আবাদুল আসরী (সপ্তম শ্রেণীতে পাঠ্য)
১৩. আল-আদাবুল আসরী (অষ্টম শ্রেণীতে পাঠ্য)
১৪. তাজরীদুল বুখারী
১৫. উর্দূ-বাংলা অভিধান (৭ হাজার শব্দ সম্বলিত)।
১৬. উলূমুল কোরআন (১৯৬৪ সনে প্রথম ছাপা হয়)।
১৭. কামূসুল লুগাতুল কোরআন (আল কুরআনের অভিধান) (অপ্রকাশিত)।
১৮. আল-আযহারের ইতিহাস (অপ্রকাশিত)।
১৯. ইসলামের ইতিহাস, সপ্তম খণ্ডে সমাপ্ত (অপ্রকাশিত)।
২০. আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস (অপ্রকাশিত)।
২১. পাকিস্তান পরিচিতি (অপ্রকাশিত)।
২২. বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমান (অপ্রকাশিত)।
২৩. মসজিদের দেশ বাংলাদেশ (অপ্রকাশিত)।
২৪. সোনার বাংলার হাকীকত (অপ্রকাশিত)।
২৫. বাংলা-আরবী শব্দকোষ।
২৬. পত্রিকা ও ম্যাগাজিন।
২৭. ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা।
২৮. হিন্দু ধর্ম ও দর্শন (অপ্রকাশিত)।

২৯. বাইতুল মাকদাসের ইতিহাস (অপ্রকাশিত)।
৩০. আদদিয়ানাতুল ইসলামিয়া (আরবী) (অপ্রকাশিত)।
৩১. দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইসলাম।

এখন আমরা তাঁর রচিত প্রতিটি পুস্তকের ওপর ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করবো, যাতে তাঁর প্রতিভার মূল্যায়ন করা সহজ হয়।

১. আরবী-বাংলা অভিধান

আরবী-বাংলা অভিধান বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত দেশের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ আরবী অভিধান। আশি হাজার বিভিন্ন আঙ্গিকের শব্দ ও তার বাস্তব প্রয়োগের উপমাসহ বিভিন্ন চিত্র দ্বারা চিত্রিত অনুপম আঙ্গিকে মুদ্রিত এ অভিধানটি বাংলা-আরবী ভাষায় একমাত্র পূর্ণাঙ্গ অভিধান। প্রায় অর্ধশতাব্দি পূর্বে রচিত এ অভিধানটির সমকক্ষ বা উত্তম কোনো অভিধান আজও রচিত হয়নি। এদিক থেকে উহা কালজয়ী। মূলত অভিধান রচনার কাজ দুরূহ। অনেকে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারের জন্য শত আগ্রহ দেখালেও অভিধান রচনার মতো এ দুরূহ ও মহৎ কাজে হাত দেন না। তিনি তাঁর অভিব্যক্তি বিদগ্ধজনের কাছে প্রকাশ করলে তারাও এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন। এদের মধ্যে ড. এনামুল হক, ড. সিরাজুল হক, ড. এ. কে. এম আইয়ুব আলী অন্যতম। কথিত আছে যে, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পবিত্র মক্কায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে বাংলা ভাষায় আরবী চর্চার উপকরণের এক প্রশ্নের জবাবে কিছু দেখাতে না পেরে সম্মেলন থেকে ফিরে এসে আরবী-বাংলা অভিধান রচনার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে এর দায়িত্ব আযহারীর ওপর ন্যস্ত করেন। উক্ত অভিধান রচনাকালে তাঁর সহকর্মী প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা মতে, আযহারী সাহেব সকলের শেষে ঘুমিয়েছেন এবং সকলের আগে ঘুম থেকে উঠেছেন।

নতুন কিছুর সৃষ্টির উম্মাদনায় যাদেরকে পেয়ে বসে তারা ঘুমাতে পারেন না। তাঁর দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে অল্পদিনের মাঝেই এ অভিধান রচনার কাজ শেষ হয় এবং বাংলা একাডেমী তা প্রকাশ করে জাতির দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হয়। দেশ মুক্তি পায় একটি অপবাদ থেকে। এ অভিধান রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আযহারী সাহেব নিজেই বলেন, আমি যখন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখনই আমার মনে এরকম একটি অভিধান রচনার আগ্রহ জাগ্রত হয়। পরে আল্লাহ আমার আগ্রহ পূর্ণ করেন। আশি হাজার বিভিন্ন

আঙ্গিকের শব্দ সম্বলিত সাতাশ শত বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠার ডিমাই সাইজের তিন খণ্ডের এ অভিধানটি প্রথম ১৯৭০ সনে প্রকাশিত হয়। বাংলা একাডেমী এর অর্থের যোগান ও প্রকাশনার তত্ত্বাবধান করে। শব্দের মূল দিকে না তাকিয়ে বরং এর ব্যবহারের আঙ্গিকে সাজানো শব্দ অনুসারে বিন্যাসকৃত অভিধানটি এক রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করে। আরবী চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন মাইল ফলকের সূচনা হয়।

প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ এনামুল হক এ অভিধানের ভূমিকা লিখে তাঁকে আরো মূল্যবান করে তোলেন। আযহারী সাহেব নিজে প্রায় চল্লিশ পৃষ্ঠার এক মুখবন্ধ লিখে এতে আরবী ব্যাকরণের বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের উল্লেখ করে একে আরো সমৃদ্ধ করে তোলেন। কম্পিউটারের পূর্বে যখন বিভিন্ন চিহ্নের ব্যবহার সামান্য মাত্রায়ও শুরু হয়নি তখন আযহারী সাহেব এর ব্যবহার করে বাংলা সাহিত্যে এক নবদিগন্তের ধারা উন্মোচন করেন।

আরবী শব্দের অর্থকরণের সময়ে তিনি প্রচলিত, সাবলীল, ব্যবহৃত ও মর্মার্থ বোধক শব্দ চয়ন করেন এবং আরবী ভাষাভাষীরা কী অর্থে উহা ব্যবহার করে এবং কুরআন হাদিস ও ইসলামী প্রামাণ্য গ্রন্থে কী অর্থে উহা ব্যবহৃত হয়েছে তা উল্লেখ করে এ অভিধানকে আরো সমৃদ্ধশালী করেন। এক কথায়, যে দিক থেকে যে কোনো কারো মনেই ভাষা সম্পর্কিত জাগ্রত প্রশ্নের উত্তর এর মাঝে অনায়াসে পেয়ে গেছে। এক কথায় অভিধানটি জাতির চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছে। জাতি আযহারীকে স্মৃতির মণিকোঠায় স্থান দিয়েছে। তাই সফল আযহারী, সফল তাঁর কর্মকাণ্ড। যুগ যুগ ধরে সাহিত্য-প্রেমিকদের মনের খোরাক জোগাবে ও উহার ফল্গুধারা এ বসুন্ধরাকে মাতোয়ারা করবে যুগ-যুগান্তরে।

উল্লেখ্য যে, বাংলা একাডেমী উক্ত অভিধানের প্রকাশনা আজও অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে ছোট খাটো আরও দু'একটি অভিধান প্রকাশ পেলেও আযহারী সাহেবের অভিধান শীর্ষস্থানে আছে।

২. বাংলা-আরবী অভিধান

বাংলা-আররী অভিধান আল আযহারীর একটি অন্যতম অবদান। আমাদের কাছে উহার যে কপিটি এসেছে তা ১৯৭৭ সনে প্রথম প্রকাশ হয়। উহার প্রকাশক ছিলেন তার স্ত্রী জাহানারা বেগম। এবং উহা ঋষিকেশ দাশ লেন, ঢাকা-১ এর জাহানারা ফাইন আর্ট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। ২৬৪ পৃষ্ঠার মাঝারি সাইজের এই বইটিতে বাংলা স্বরবর্ণের ক্রমানুসারে শব্দগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। এ

বইটির আর কোনো খণ্ড প্রকাশিত না হলেও উহার রচনা পদ্ধতি ও কিছু পাণ্ডুলিপি তার উত্তরাধিকারদের কাছে এখনও আছে। আলাউদ্দীন আল-আযহারী উক্ত বইটিতে বাংলা স্বরবর্ণের প্রায় পাঁচ হাজার শব্দের স্থান দিয়েছেন এবং প্রতিটি বাংলা শব্দের একাধিক আরবী অর্থ দিয়েছেন। ইহা আরব জাহানের সাথে বাংলার সম্পর্ক গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মূলত এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা বাংলা ভাষাভাষী লোকেরা এমন একটি অভিধানের জন্য দীর্ঘদিন যাবত অপেক্ষায় ছিলেন। এই অভিধান তাদের সে চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়। তিনি এই বইতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা হলো প্রতিটি শব্দেরই তিনি ক্রমধারা রক্ষা করেন এবং বাংলা ভাষায় যে প্রত্যয়সহ অন্যান্য ব্যাকরণগত পরিভাষার মাধ্যমে পরিবর্তন সাধিত হয় তা দেখিয়েছেন। যেমন ঃ প্রথমে অ ও আ প্রত্যয় দিয়ে গঠিত শব্দমালা। যা সাধারণত আরবী ব্যাকরণে নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক লা থেকে ধার করা হয়েছে। যেমন ❖ অনন্ত ❖ অমত ❖ অনিচ্ছ ❖ অসহযোগ ❖ আকর্ণ ❖ আজন্ম ❖ আগমন ❖ আকাড়া ❖ আসমুদ্রহিমাচল ❖ আপক্ক তদ্রুপ উক্ত অভিধান বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত পদ, প্রত্যয়, ব্যাস বাক্য ইত্যাদির যে উপমা দেয়া হয়েছে তা যথার্থ হয়েছে। বাংলা বাগধারার যে সাবলীল অনুবাদ করা হয়েছে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে আরবী ভাষা আরও সহজ হয়েছে ও ইংরেজি ভাষার সাথে উহার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে। অন্য কেউ এখন পর্যন্ত এ ধারা অতিক্রম করতে সক্ষম হননি। বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত ছোট-বড় যে চার পাঁচটি বাংলা আরবী অভিধান বের হয়েছে তন্মধ্যে আযহারী সাহেবের অভিধান সর্বপ্রথম ও আজও সবার শীর্ষে। সহসা এর সমকক্ষ বের হবার তেমন সম্ভাবনা নেই।

৩. আধুনিক আরবী কথাবার্তা

ইহা আল-আযহারী সাহেবের একটি অনবদ্য অবদান। আমাদের কাছে যে কপিটি হস্তগত হয়েছে তা এর প্রথম সংস্করণ, যা ১৯৭৮ সনে জানুয়ারি মাসে জাহানারা আর্ট প্রেস থেকে ছাপা হয়। উহার প্রকাশক ছিলেন তাঁরই স্ত্রী জাহানারা আযহারী। চৌষট্টি পৃষ্ঠার এ বইটিতে তিনি সাধারণভাবে জীবন-যাপনের জন্য যেসব বিষয়ে কথাবার্তার প্রয়োজন হয় উহা অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। সাথে সাথে তিনি জীবনে ব্যবহৃত বাক্যাবলী দিয়েই একে সাজিয়েছেন।

বইটিকে তিনি প্রথমত দুটি ভাগে ভাগ করেছেন–

❖ প্রথম ভাগে আরবী ব্যাকরণের মৌলিক নিয়মাবলী।

❖ দ্বিতীয় ভাগে আরবী কথাবার্তা।

পরিশেষে তিনি আধুনিক আরবীর একটি শব্দকোষ দিয়েছেন। এটিও একটি ভাগ হিসেবে গণ্য করা যায়।

প্রথমভাগে তিনি আরবী বর্ণমালা, উহার স্বরচিহ্ন এবং প্রধান প্রধান বিভক্তিগুলো তুলে ধরেন। এবং প্রথমভাগটিকে আবার পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেন, যাতে কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীকে অযথা হয়রানি হতে না হয়। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ : যার প্রথম ইসম দিয়ে শুরু হয়েছে। যেমন যায়েদ জ্ঞানী।
২. জুমলায়ে ফেয়েলিয়্যাহ : যার প্রথম ফেয়েল দিয়ে শুরু হয়েছে। যেমন : যায়েদ গেল।
৩. জুমলায়ে জরফিয়্যাহ : যার প্রথম হরফে জার দিয়ে শুরু হয়েছে। যেমন : লোকটি বাড়িতে।
৪. জুমলায়ে শরতিয়্যাহ : যার প্রথম হরফে শর্ত দিয়ে শুরু হয়েছে। যেমন : যদি তুমি যাও আমিও যাব।
৫. জুমলায়ে ইসতেফহামিয়্যাহ : যার শুরুতে হরফে ইসতেফহাম হয়। যেমন : তুমি কি লিখেছ?

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত ব্যাকরণের আলোকেই কথপোকথনগুলো সাজান। নিম্নে আমরা উহার শিরোনাম বর্ণনা করছি।

- অনেক দিন পরে বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার পরে কথাপোকথন।
- বাড়িতে একজনের সম্বর্ধনা জানানোর জন্য কথাবার্তা।
- দুই ব্যক্তির মধ্যে পরিচিতির সময় কথাবার্তা।
- বিদেশীদের সাথে কথাবার্তা।
- দেশ তথা মাতৃভূমি সম্পর্কে কথাবার্তা।
- কেনা-বেচা সম্পর্কে কথাবার্তা
- দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে কথাবার্তা।
- খাওয়া ও পান করা সম্পর্কে কথাবার্তা।
- গৃহ ও গৃহসামগ্রী সম্পর্কে আলোচনা।
- শিল্প-কারখানা এবং কর্মস্থান সম্পর্কে আলোচনা।
- ভ্রমণ সম্পর্কে আলোচনা।
- ডাক্তার ও রোগ সম্পর্কে আলোচনা।
- ব্যাংক সম্পর্কে আলোচনা।
- পোস্ট অফিস ও উহার সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আলোচনা।
- কলেজে দুই ছাত্রের মাঝে আলোচনা।

- দিক, সময় এবং অভ্যাস সম্পর্কে আলোচনা।
- হোটেল এবং উহার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আলোচনা।
- ড্রাইভার এবং যাতায়াত সম্পর্কে আলোচনা।
- টেলিফোন সম্পর্কে আলোচনা।
- থানায় ইজাহার সম্পর্কে আলোচনা।
- পেশা সম্পর্কে আলোচনা।
- কৃষি কাজ সম্পর্কে আলোচনা।
- নির্মাণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে আলোচনা।
- ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা।
- হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা।

তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি উক্ত বইয়ে ব্যবহৃত শব্দাবলীর একটি তালিকা সন্নিবেশিত করেন। যা ইহা বুঝতে বেশ সহায়ক হয়েছে। উক্ত বইয়ে তিনি জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য শব্দাবলী ব্যবহার করেন এবং প্রতিটি শব্দকে তিনি হরকত প্রদান করেন। যা আরবী জানা সকলকে উহার মর্ম উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হয়। মাঝে মাঝে তিনি মিশরীয় স্থানীয় পরিভাষা ব্যবহার করেন। সর্বদিক থেকে বইখানা উত্তম।

এই বইয়ের এক অংশে তিনি আধুনিক আরবী ও কথ্য আরবীর ওপর ছোট্ট অথচ সুন্দর একটি আলোচনা পেশ করেন। আরব জাহানের বিভিন্ন দেশে আরবী ভাষা মাতৃভাষা হলেও উহার মাঝে যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে তা তিনি দেখিয়ে দেন। কোন দেশের লোকেরা কোন শব্দকে কি উচ্চারণ করে আর উহার ব্যাকরণগত অবস্থা কি তা তিনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। আমাদের দেশে আরবী শিক্ষিত লোকেরা আরব জাহানের লোকদের কথা স্বাভাবিকভাবে কেন বুঝে না এবং ভাষাগত আদান-প্রদানের বিভিন্ন রকম যেসব সমস্যা রয়েছে তা উল্লেখ করে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। অন্য কোন লেখক এ বিষয় নিয়ে আজও কলম ধরেছেন বলে আমাদের জানা নাই।

৪. সহজ আরবী শিক্ষা

সহজ আরবী শিক্ষা বইটি এদেশে আরবী শিক্ষার ব্যাপারে এক যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। বইটি প্রথম ১৯৭৬ সালে মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। এবং ১৯৭৮ সালে ডিসেম্বর মাসে উহার পুনর্মুদ্রণ হয়। উহা পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপে ২০০৪ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। তাঁর উক্ত

বইয়ের প্রকাশক ছিলেন তাঁর স্ত্রী জাহানারা। ১১৮, বড় মগবাজার, ঢাকা-১ অবস্থিত জাহানারা ফাইন আর্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। উহার কম্পোজিটর ছিলেন মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ মিয়া। তিন শতাধিক পৃষ্ঠার এই বইটির দাম ছিল মাত্র দশ টাকা। এই বইটির বর্ণনাভঙ্গি ও শব্দের সাবলীল ব্যবহার এবং ব্যাকরণের দিকনির্দেশনা উহাকে ছোট সাইজের একটি বিশ্বকোষে পরিণত করে। আযহারী সাহেব তাঁর অভ্যাসমত সাবলীল সহজ শব্দের ব্যবহার করেন। প্রতিটি অধ্যায়কে অনুশীলন দিয়ে অলংকরণ করেন। নিম্নে আমরা ঐ বইয়ের সূচির ওপর একটু আলোকপাত করছি যাতে উহা অনুধাবন করতে সহায়ক হয়।

প্রথম : ব্যাকরণের মূল বিষয় সম্পর্কে ও আরবীর হরকত ও গঠনাবলী বিষয় সম্পর্কে।

দ্বিতীয় : বাক্যের অংশ, যেমন : ইসম, ফেয়েল ও হরফ। অতঃপর ইসম তিন প্রকার। যেমন ঃ ইসমে জামেদ, ইসমে মাসদার ও ইসমে মুশতাক সম্পর্কে আলোচনা।

তৃতীয় : ইসমের পরিচিতি চিহ্ন অতঃপর নাকেরা ও মারেফা সম্পর্কে আলোচনা।

চতুর্থ : জিনস এবং উহার প্রকারভেদ– পুরুষ ও স্ত্রী সম্পর্কে এবং মুয়ান্নাছের চিহ্ন এবং আরবীয়রা মুয়ান্নাছ হিসেবে যে একক শব্দাবলী ব্যবহার করেন সে সম্পর্কে।

পঞ্চম : সংখ্যা এবং উহার প্রকারভেদ– একবচন, দ্বি-বচন এবং বহুবচন, উহার সিগাহ, অতঃপর বহুবচন এর প্রকারভেদ, সহীহ ছালেম মুকাসসার এবং উভয়টার উদাহরণ স্পষ্টভাবে অতঃপর বহুবচনের জমা কিল্লাত ও কাছরাত এবং উহার ওজন ও উদাহরণসহ আলোচনা।

ষষ্ঠ : ইসমে সিফাত, তারিফের আলোচনা এবং যা মওসুফ ও সিফাতের মাঝে মিল হওয়া আবশ্যিক। সিফাতের মিল বিষয়গুলো ও ব্যবহার বিধি সম্পর্কে উদাহরণসহ আলোচনা।

সপ্তম : ইসমে জমীর এবং তার আলোচনা ও প্রকারভেদ, মুত্তাসেল ও মুনফাসেল এবং উভয় প্রকারভেদের শ্রেণী ও উহার উদাহরণ স্পষ্টভাবে আলোচনা।

সার্বিক বিবেচনায় বইখানি অনুপম, যা উহার পাঠকের মনে শিহরণ জাগায়, ছন্দের তালে তালে তা আয়ত্ব করাও বেশ সহজ।

৫. আল-ইনশাউল আছ্‌রী (আধুনিক রচনা)

পাকভারত উপমহাদেশে ইসলাম আগমনের সাথে সাথেই আরবী চর্চা শুরু হয়। অসংখ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আরবী চর্চা বিদ্যমান। কিন্তু ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক কারণ বাংলাদেশে আরবী-ফারসি শব্দের ব্যবহার দ্রুত মাত্রায় কমতে থাকলে নতুন প্রজন্ম দ্বীন ইসলাম ও ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে। ধর্মনিরপেক্ষতার লেবাসে ধর্মহীনতার কাজ পুরোদমে এগিয়ে চললে আযহারী এ সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে রুখে দাঁড়ান। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে তিনি আধুনিক আরবীর একটি সিরিজ লিখে ফেলেন। তাঁর এ সিরিজের অন্যতম বই হলো আল-ইনশাউল আছ্‌রী।

এ বইটি বিভিন্ন আঙ্গিকে সুন্দর হওয়ার কারণে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার মাদরাসা বোর্ডের আলিম ও ফাজিল শ্রেণীর জন্য পাঠ্যতালিকাভুক্ত করে। যার স্মারক নম্বর ছিল S-১০৮৮ তারিখ ২৭-২-১৯৬৮ ইং। অল্পদিনের মাঝেই এ বইটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তাই উহার অসংখ্য সংস্করণ বের হয়। পূর্বের কোনো নমুনা ছাড়াই তিনি আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দি পূর্বে যে পুস্তক রচনা করেছেন তার সমকক্ষ পুস্তক আজও রচিত হয়নি। বইটির শুরুতেই তিনি রচনা, রচনার জরুরি বিষয় ও রচনার উপাত্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর একটি আলোচনা পেশ করেন, যা যে কোনো বিষয়েই যে কোনো পরিমাণের রচনা লিখতে বেশ সহায়ক হয়। প্রয়োজনবোধে উহাকে কমবেশি করলেও মূল ভাবার্থের কোনো পরিবর্তন ও ছন্দপতন হবে না এভাবে তিনি বাক্যবিন্যাস করেন।

এ বইতে তিনি ধর্মীয় বিষয় থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পরিভাষাসমূহ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের ওপর রচনা লিখেন। যেমন : ইসলাম ধর্ম ও জাতিসংঘ। শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে তিনি জটিল শব্দকে এড়িয়ে সহজ অথচ বেশি ব্যবহৃত শব্দকে বেছে নেন। ফলে উহা আপামর জনসাধারণের বোধগম্য হয়ে উঠে। অন্য ভাষার যে সমস্ত শব্দ বাংলায় একাকার হয়ে গিয়েছে সেসব শব্দের অনুবাদ না করে সরাসরি ঐ শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। যেমন : ইউনিসেফ, প্যানপেসিফিক, হোটেল ইত্যাদি। তিনি ইহা রচনার সময়ে সাধারণভাবে খেয়াল করেছেন যেন উহা বেশি বিষয়ে সন্নিবেশিত হয়। তাই ১৬০ পৃষ্ঠার বইটিতে তিনি ৭০টিরও অধিক বিষয়ে রচনা পেশ করেন। এ বইয়ের শেষের দিকে তিনি কয়েকটি আরবী

পত্রের নমুনা পেশ করেন যা বইটির মান আরো বৃদ্ধি করেছে। বইটির কোনো শব্দ বুঝতে যেন কোনো প্রকার বেগ পেতে না হয় সেজন্যে প্রত্যেকটি প্রবন্ধের কঠিন কঠিন শব্দগুলোর সাবলীল বাংলায় অনুবাদ করেন। বর্তমান সময়ে ঐ বিষয়ের যে সমস্ত পুস্তক বাজারে পাওয়া যায় তার মাঝেও উহা বিদ্যমান। সুতরাং এ বইটি কালজয়ী। ইহা বাংলাদেশে আরবী চর্চার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

৬. হাজিহি হিয়া বাংলাদেশ (এইতো বাংলাদেশ)

১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পরে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচারের সাথে বিশ্বময় প্রচার হতে থাকে যে, বাংলাদেশের লোকজন তার স্বজাতীয় ভাইদের সাথে যুদ্ধ করে আলাদা হয়ে যাওয়ায় তাদের ঈমান-আকিদা সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয়।

আরব জাহান এই নবোদিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে চাচ্ছিল না যে, ঐখানে ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্য আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে আরব জাহানে এ দেশের লোকেরা বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে থাকে। দেশের ক্রান্তিময় মুহূর্তে আযহারী সাহেব বাংলাদেশের পরিচিতি তুলে ধরার জন্য হাজিহি হিয়া বাংলাদেশ (এইতো বাংলাদেশ) নামের এই পুস্তকটি রচনা করেন।

এই বইটি ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। উহার মাধ্যমে আযহারী সাহেব বুঝাতে সক্ষম হন যে, বাংলাদেশ তার ঐতিহ্য ও অবস্থান থেকে মোটেও বিচ্যুত হয়নি। পাকিস্তানের সাথে এ যুদ্ধ ছিল অন্যায় শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। এবং এ দেশটিতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে সহঅবস্থানের এক বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে ইতোমধ্যেই খ্যাতি লাভ করেছে। এ বইয়ে তিনি বাংলাদেশের ছোট-বড় সমস্ত দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন। যেমন : (১) ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, (২) স্বাধীনতা যুদ্ধ, (৩) নতুন দেশ বাংলাদেশ, (৪) এর ভূমি, জনগণ ও পোশাকাদি, (৫) ঈদ-উৎসব, (৬) আইন-কানুন, (৭) সরকার ও সংসদ, (৮) পররাষ্ট্রনীতি, (৯) বাংলাদেশ ও আরব বিশ্ব, (১০) শিক্ষা, (১১) ভাষা ও সাহিত্য, (১২) কৃষি, (১৩) শিল্প, (১৪) সংবাদ, রেডিও ও টেলিভিশন, (১৫), রপ্তানি পণ্য, (১৬) গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান, (১৭) বাংলাদেশের সাধারণ বিষয়াবলী।

মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ মিয়ার তত্ত্বাবধানে ১৭৪ আজিমপুর, ঢাকা থেকে ও ১১৮ মগবাজার কাজী অফিস লেন ঢাকাস্থ সাহিত্য পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত বইটি তার ক্ষেত্রে আজও স্বকীয়তার দাবিদার। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ওপর পরিচিতিমূলক যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে তার সবগুলোতেই উহার রীতি স্পষ্ট।

আরবী পরিচিতিতে উহা আজও অদ্বিতীয়। এই বইটি বাংলাদেশে আগত পর্যটকদের জন্য একটি গাইড বুক হিসেবে আজও কাজ করছে।

৭. ইসলামিয়াত

আযহারী সাহেবের রচনাগুলোর অন্যতম হলো, ইসলামিয়াত (এইচ. এস. সি ও ডিগ্রী শ্রেণীর ইসলামিয়াত)। আমাদের কাছে উহার যে কপি এসেছে তা ১৯৭০ সনে প্রথম প্রকাশ হয়। বইটির প্রকাশক ছিলেন মুহাম্মদ আব্দুস সোবহান এম. এম। এবং ইহা ঢাকাস্থ 'কোরআন মহল' লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়। ক্রাউন সাইজের এই ১২০০ শত পৃষ্ঠার বইটিতে ইসলামী বিষয়াবলীর দশটিরও অধিক বিষয়ের আলোচনা করেন। এ বইটি পাঠ্য তালিকায় থাকার কারণে বারবার প্রকাশিত হয়। আমরা উহার ষষ্ঠ সংস্করণের ওপর ভিত্তি করে আলোচনা করছি। এ বইটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ছিল। বলা হয় যে, উহা প্রণয়নে প্রফেসর এ. টি. এম ইব্রাহিম ও মাওলানা আব্দুস শহীদ তাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন।

এ বইটির দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে যে, তিনি বিষয় চয়নে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। যুগ চাহিদার আলোকে ইসলামী বিষয়গুলিকে ঢেলে সাজিয়েছেন। তাই উহা হয়েছে অনবদ্য। প্রতিটি রচনার সাথে সাথেই নির্ভরযোগ্য সূত্রের বর্ণনা থাকায় উহার মান বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কঠিন কঠিন শব্দগুলোর সাবলীল অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উহার মর্ম উদঘাটনে সহায়ক হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে অনুশীলনী থাকায় ছাত্রের মেধা যাচাইয়ে সহায়ক হয়েছে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণে বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

যেকোনো বিষয়ে আধুনিক সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশনা থাকায় উহা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। ইসলামী শিক্ষা বর্ণনায় তিনি তার পুস্তককে মূলত ৭ ভাগে ভাগ করেন। (১) কুরআন ও উহার আনুষঙ্গিক বিষয়, (২) আকীদাগত বিষয়, (৩) হাদিস ও উহার আনুষঙ্গিক বিষয়, (৪) ইসলামী আইন,

(৫) ইসলামের ইতিহাস, (৬) ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান, (৭) ইসলামের সামাজিক বিধান। পরিশেষে আরবী সাহিত্যের অংশ জুড়ে দিয়ে আরবী সাহিত্যের একটি সামগ্রিক বই হিসেবেও প্রস্তুত করেন।

৮. তাফসীরে আযহারী

আযহারী সাহেব আরবী ভাষার পুস্তক রচনা করলেও মূলত তিনি ছিলেন প্রখ্যাত মুফাসসির। তাঁর তাফসীর মাহফিলে অগণিত মানুষ অংশগ্রহণ করতো। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মাহফিলে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। তাঁর তাফসীর করণের পদ্ধতি ছিল স্বতন্ত্র। যেকোনো মানুষ তাঁর মনের মাঝে উদিত সকল প্রশ্নের জবাব এমনিতেই পেয়ে যেত। এছাড়াও তিনি প্রতিটি মাহফিলেই শ্রোতাদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য সময় দিতেন। শ্রোতারা ইচ্ছামতো প্রশ্ন করে পরিতৃপ্ত হতেন। সত্যিকারভাবেই আযহারী ছিলেন কোরআনী জ্ঞানের এক মহান ব্যক্তি। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সুবাদে কোরআন নাযিলের প্রায় প্রতিটি স্থান ও ঘটনা প্রবাহের নিদর্শনসমূহ স্বচক্ষে অবলোকন করার বিবরণ মানুষচক্ষে ত ভেসে উঠতো। তিনি মাহফিলে বললে শ্রোতাদের হৃদয়ে ধ্বনিত হতো। দেশের সকল স্থান হতেই তাঁকে তাফসীর লেখার জন্য আবেদন করলে তিনি এ কাজে হাত দেন। কিন্তু তাফসীরের ভূমিকা ও সূরা ফাতিহার তাফসীর ছাড়া অন্য কিছুই তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। যদিও তাঁর আরো কয়েকটি সূরার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। আমাদের হাতে তাফসীরে আযহারীর প্রথম খণ্ড পৌঁছেছে যা ১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারি 'এশিয়াটিক প্রেস' ৩৮ নম্বর মৌলভীবাজার, ঢাকা থেকে এ. কে. এম আব্দুল হাইয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত আলিমে দীন শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসেন ১৩৮২ হিজরীর শাবানের ২ তারিখে উহার ভূমিকা লেখেন।

উক্ত ভূমিকায় তিনি একে তাফসীর জগতের এক অনন্য কিতাব হিসেবে অভিহিত করেন। আর সর্বদিক থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবার কারণে উহা পাঠক সমাজে ব্যাপক সমাদৃত হয়। তিনি তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখেন, তাহলো ভূমিকায় তিনি প্রখ্যাত তাফসীরকারদের কুরআন সম্পর্কিত অভিমতকে বর্ণনা করেন। যেমন : ইমাম তাবারী (রহঃ) ভাষার ক্ষেত্রে তিনি সহজ বাংলা অবলম্বন করেন। যাতে কুরআনের মর্ম উদঘাটন সহজ হয়। প্রতিটি বর্ণনার ক্ষেত্রেই সারসংক্ষেপে শিক্ষণীয় বিষয়কে তুলে ধরেন। সূরার নামকরণের বিষয়টিও উল্লেখ করেন। যথার্থভাবেই সূরার শানে নুযুল উল্লেখ করেন। পরিপূর্ণভাবে সহজ অনুবাদ করেন। আয়াতের শাব্দিক ও ভাবার্থ উল্লখ

করেন। প্রয়োজনবোধে টিকা সংযোজন করেন। নতুন ও প্রাচীন তাফসীরগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তিনি তাফসীর রচনা করার সময় প্রকাশিত সকল প্রামাণ্য তাফসীর গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষায় পূর্বে প্রকাশিত তাফসীরসমূহে কি কি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ও জনগণ কি কি বিষয়ে জানতে চায় এ দুয়ের মাঝে এক সমন্বয় সাধন করে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের জয়-জয়কার ও বিশ্বব্যাপী শিল্প উন্নয়নে উদ্দীপনায় সকলে মেতে উঠলেও তারা যে কুরআন থেকে দূরে সরে গিয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং উহা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র সমাধান আল কুরআন অধ্যয়ন তা তিনি তুলে ধরেন। তাঁর প্রামাণ্য তাফসীর গ্রন্থটি সর্বদিক থেকে অনন্য, আকারে ছোট হলেও উহা নিজস্ব স্বকীয়তায় আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

৯. নীতি ও দুর্নীতি

মূলত আযহারী ছিলেন একজন সমাজ-সংস্কারক। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এ জন্যে তিনি সামাজিক বিষয়াবলীকে ইসলামীকরণের জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হলো 'নীতি ও দুর্নীতি' নামক বইটি রচনা করা। উক্ত নাম দিয়ে তাঁর ঈমানী দায়িত্ব পালন করেছেন ও সমাজে একটি উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আযহারী সাহেব নরম স্বভাবের লোক হলেও ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর। যেমন সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুরআনে এরশাদ হয়েছে, কাফেরদের উপর খুবই কঠিন ও নিজেদের মাঝে খুবই দয়ালু হওয়ার।

ইসলামের সাথে কোনো বিষয়ে তিনি আপোষ করেননি। নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে বিভিন্ন নামে সমাজের মধ্যে যেসব কুসংস্কার বিস্তার করেছিল তিনি তা সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। সাবলীল বাংলা ভাষায় রচিত ৩২ পৃষ্ঠার এই বইটি প্রথম ১৯৬৯ সালে প্রকাশ হয় ও ১৯৮১ সালে পুনর্মুদ্রণ হয়। দিনাজপুর জিলা মসজিদ মিশনের সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুর রহিম উহা প্রকাশ করেন। দিনাজপুরের কালিতলার রেজা প্রিন্টিং প্রেসে উহা মুদ্রিত হয়। প্রাপ্তিস্থান হিসেবে দিনাজপুরের স্টেশন রোডস্থ লাকী ফার্মেসীর বর্ণনা দেখা যায়।

এ বইটির মূল্য ছিল মাত্র ২ টাকা। এ বইটির দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ধর্মের নামে অধর্মের যে সমস্ত কাজ সমাজে ঢুকে পড়েছে উহার শরীয়তসম্মত ব্যাখ্যা ও ইসলামের দৃষ্টিতে উহার অবস্থান এবং উহা সমাজে কি কি ক্ষতি করছে উহার বর্ণনা দেন ধর্মীয় আলোকে।

উক্ত বইয়ের বিষয়াবলীকে প্রধান ৪ ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটির অধীনে ছোট ছোট বিষয়গুলির উল্লেখ করেন যাতে করে লোকদের সতর্ক হওয়া সহজ হয়।

১. জন্ম উৎসবে অবৈধ কাজ : (ক) নবজাত সন্তান দেখা প্রথা, (খ) শিশুর মুখে ভাত, (গ) আকীকা, (ঘ) খৎনা, (ঙ) জন্ম উৎসব।
২. বিয়ে-শাদীতে অনৈসলামী রীতি-নীতি : (ক) বিয়ে-শাদীতে প্রারম্ভিক প্রথা, (৩) অত্যধিক মোহর দেয়া, (গ) ওলীমায় অর্থের অপচয়, (ঘ) লোক দেখানোর জন্য উপঢৌকন দেয়া, (ঙ) বিয়ে-শাদীতে নাচ-গান ও বাদ্য-বাজনা।
৩. সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে শরীয়ত বিরোধী কাজ : (ক) শবে-বরাত, (খ) জুয়া খেলা, (গ) ভিক্ষাবৃত্তি।
৪. মৃত্যু সম্পর্কীয় অনুষ্ঠানসমূহে অবৈধ প্রথা : (ক) ত্যাজ্য সম্পত্তির অপচয়, (খ) অনাথ সন্তানদের সম্পদের অপব্যবহার।

সত্যি কথা বলতে কি আযহারী সাহেব এ ছোট্ট পুস্তিকাটি রচনা করে যে এক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা পরবর্তীকালে ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত সকলের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ছোট্ট এ বইখানি এদেশে শত সহস্র বছর থেকে প্রচলিত সাংস্কৃতিক বলয়ে যে দুর্বার আঘাত হেনেছে তার ঐতিহাসিক মান অনেক বেশি।

১০. অমুসলিমদের জন্য ইসলামী আইনের সূত্র ও নীতিমালা

মূলত আযহারী সাহেব ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম। কিন্তু বিশ্বের প্রধান ভাষাসহ ১৭টি ভাষা তিনি বলতে, পড়তে ও লিখতে পারতেন। ষাটের দশকে এদেশের সাধারণ শিক্ষিত পণ্ডিতরাও ইংরেজিতে একটি দরখাস্ত লিখতে হিমশিম খেতেন। তখন আযহারী সাহেব একজন মাদরাসা শিক্ষিত লোক হয়েও ইংরেজি ভাষায় ১১২ পৃষ্ঠার একটি বই লিখে এক নতুন ইতিহাসের সূচনা করেন। আধুনিক ইংরেজিতে লিখিত The Theory and Sources of Islamic Law for Non-Muslims. অর্থাৎ অমুসলিমদের জন্য ইসলামী আইনের সূত্র ও নীতিমালা– এ বইটি ছোট হলেও ইহা তদানীন্তন সময় সমাজ ও সামাজিক বন্ধন ঠিক রাখতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে ষাটের দশকে এদেশের অমুসলিমরা যখন মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হবার ভূয়া খবর প্রচার করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাতে সচেষ্ট ছিল মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই উহা এড়াতে চাইলেও যেকোনোভাবেই উহা তাদের দিকে

সম্পর্কিত করা হতো। অমুসলিমদের জন্য ইসলামে কি কি বিধি-বিধান রয়েছে তা অবগত হওয়া এদেশের জনগণের অপরিহার্য ছিল। তখন আযহারী সাহেবের এ বই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উক্ত বইটি সরকারি আলিয়া মাদরাসা ঢাকার গবেষণা ও প্রকাশনা সেক্রেটারি কর্তৃক ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এশিয়াটিক প্রেস '৭৮ নং মৌলভীবাজার, ঢাকা-১ হতে এ. কে. এম আব্দুল হাই উহা প্রকাশ করেন। ক্রাউন সাইজের ১১২ পৃষ্ঠার এই বইটির দাম ছিল মাত্র ১২ টাকা।

বইটির ভূমিকা লিখেন জ্ঞান-তাপস ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৬২ সালের ১লা নভেম্বরে। উক্ত বইয়ের সূচিতে অমুসলিমদের প্রয়োজনীয় সকল আইন-কানুন সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষের দিকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিশ্বের মুসলিম প্রধান দেশে তথা আফগানিস্তান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, জর্দান, লিবিয়া, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সিরিয়া, তুর্কিস্থান ও ইয়ামেনের কথা নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়েছে। যা এদেশের বসবাসরত অমুসলিমের জীবন পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে অমুসলিমদের জন্য ইসলামিক আইন ও বর্তমান অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সকল বর্ণনায় উহার মূলসূত্র উল্লেখ থাকায় এটি উচ্চ শিক্ষার একটি গাইড লাইন হিসেবে কাজ করবে। পরিশেষে টেকিনিক্যাল শব্দসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বিষয়টিকে আরো খোলাসা করা হয়েছে। উক্ত বইটিতে মূলত ৯টি অধ্যায় রয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : দারুল ইসলাম, দারুল হারব ও অমুসলিমের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : জিহাদের আইন-কানুন তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : অমুসলিমদের সাথে সন্ধি ও শান্তি চুক্তি ইসলামী আইনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : অমুসলিমদের জন্য ইসলামী আইনের প্রয়োগ।

পঞ্চম অধ্যায় : খারাজ, জিযিয়া, উশর ইসলামী আইন।

ষষ্ঠ অধ্যায় : অমুসলিমদের জন্য ইসলামের বিবাহ আইন।

সপ্তম অধ্যায় : ওয়াকফ ওসিয়াত, রিসার্চের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের জন্য ইসলামী আইন।

অষ্টম অধ্যায় : অমুসলিমদের জন্য মুসলিম বিবাহ আইন।

নবম অধ্যায় : মুসলিমদের জন্য অমুসলিমদের রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক আইন।

সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে এ বইটি বাংলাদেশে অমুসলিমদের জন্য নিরাপত্তা গ্যারান্টি হিসেবে কাজ করেছে।

ভাবতে অবাক লাগে যে, আযহারী সাহেব যুদ্ধ-সংকুল ঐ সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশে বসবাসরত অমুসলিমরা কী কী সুবিধা প্রাপ্ত হচ্ছেন এবং বাংলাদেশ তথা পাকিস্তান সরকার কী কী সুবিধা প্রদান করছে তার একটি সমীক্ষা প্রকাশ করে দেশকে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে বাঁচিয়েছেন। ফলে বইটি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জাতীয় ঐক্য অটুট রাখতে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখে।

আলাউদ্দীন আল-আযহারীর রচনাশৈলী ও মূল্যায়ন

পূর্বে আমরা আযহারী সাহেবের রচনাবলী আলোচনার সময় প্রতিটি বইয়ের রচনাশৈলীর পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। তবে তাঁর লেখনীর সার্বিক মূল্যায়ন করলে যেসব বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি ফুটে উঠে তা হলো–

(ক) আযহারী সাহেব যেকোনো বিষয়েরই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতেন। সনাতনী পদ্ধতি এগিয়ে থাকতে সচেষ্ট ছিলেন। সন্দেহমূলক ও অপ্রামাণ্য কোনো কিছুই তিনি তাঁর লেখনিতে স্থান দিতেন না।

(খ) আযহারী সাহেব প্রকৃত ইসলামী রেফারেন্সের সাহায্য নিতেন। মূলত তিনি যে কোনো বিষয়ের সূত্র উল্লেখ করতে উহার মূল সূত্র তথা কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াসের উল্লেখ করতেন, শাখা-প্রশাখার নয়। যেহেতু ইহা একটি গর্হিত কাজ। বিশেষ করে কুরআন-হাদিস, ইসলামী আইন ও ধর্মীয় বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে কড়া নজর রাখতেন। অবশ্য ইসলামী আইনবিদ ও তাদের অভিমতকে সম্মান করতেন ও গুরুত্ব দিতেন। অনেক সময় দেখা যায় অনেক গবেষকরা শুধু অন্য জায়গা থেকে উদ্ধৃতি দেয়াকে যথেষ্ট মনে করতেন। তারা মূল স্রোতের কাছে যেতেন না। বরং অন্যের লেখা হুবহু তুলে দিতেন। কোনো বিষয়ের বাছ-বিচার করার প্রয়োজন মনে করেন না যে ইহা শুদ্ধ না অশুদ্ধ। এর মাঝে কিছু সংযোজন বা সংকোচন করা হয়েছে কিনা বা ইহার উদ্ধৃতি সঠিক হবে কিনা ইত্যাদি। কিন্তু এক্ষেত্রে আযহারী এক ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যিনি এই এলমী আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করেছেন। তাই আমরা দেখি যেকোনো বিষয় বর্ণনায় তিনি মূল সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

আযহারী সাহেব কখনো সস্তা বাহবা কুড়াতে চাইতেন না বা তড়িঘড়ি করে চমক লাগানোর চেষ্টাও করতেন না। সবকিছুই যুগের ওপর ছেড়ে দিতেন, আর যুগই তাকে যথাযথ মূল্যায়ন করেছে।

(গ) বিষয়ের মধ্যে আধুনিকতার সংযোজন : জীবন পরিবর্তনশীল, প্রতিদিনই তথ্যাবলী নতুন হচ্ছে, জ্ঞানের দ্বার উন্মোচন হচ্ছে, খুলে যাচ্ছে নতুন দিগন্ত, আর আযহারী এ নতুন ধারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তাই তিনি প্রতিটি রচনার ক্ষেত্রেই এ নবযাত্রার চাহিদার দিকে খেয়াল রাখতেন। সকল বিষয়ে আধুনিক চাহিদার দিকে খেয়াল রেখেই তাঁর লেখনী চালিয়েছেন। তিনি স্রোতের উল্টো দিকে চলে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছেন। দূরদর্শী জ্ঞানসম্পন্ন আযহারী একশত বছরের জাতীয় চাহিদার ভিত্তিতে যা রচনা করেছেন, তা যুগের চাহিদার পরিবর্তেও তাঁর চাহিদা কমছে না বরং বাড়ছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে তাঁর রচিত পুস্তকাদি আজও পাঠক সমাজ লুফে নিচ্ছে। আর আধুনিকতার প্রবক্তারা এর জয়গান গাইছে।

(ঘ) আযহারীর রচনাবলী বাংলাদেশে আরবী ও বাংলা সাহিত্যে এক বিপ্লবী ধারার সূচনা করেছে। তাঁর লেখনিই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবেলা করছে। আজকের বাংলাদেশে ইসলামী বিষয় মানুষকে যতটুকু আকৃষ্ট করেছে তার অন্যতম প্রেরণাকারী ছিলেন মাওলানা আযহারী। তাঁর অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করে এর আলোকে সমাজ পরিচালনা করা যুগের অপরিহার্য দাবি। একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কম করে হলেও বাংলাদেশের যতটুকু ইসলামী অনুশাসন, পালন ও ওলামায়ে কেরামদের সামাজিক অবস্থান প্রাপ্তি, বিভিন্ন আঙ্গিকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে ইসলামের যে সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার সিপাহশালার হিসেবে যে কয়জনের নাম আসে আযহারী সাহেব তাদের অন্যতম। তাঁর লেখনী এদেশে এক নতুন ইতিহাসের সূচনা করেছে। যদি এ ধারাকে চলমান রাখা যায় ও বাধাহীনভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা হলে এখানে ইসলামী শিক্ষায় বিপ্লব ঘটবে। আর তা-ই ছিল আযহারী সাহেবের পরিকল্পিত মিশন।

মূল্যায়ণ সহায়ক

আযহারী সাহেবের সমসাময়িক যুগে যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর ছাত্র, সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে পরিচিত এবং যেসব ব্যক্তির তথ্যে এ গ্রন্থ রচনায় সহায়ক হয়েছে তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাঁরা বিভিন্ন আঙ্গিকে আযহারী সাহেবকে মূল্যায়ন করেছেন।

বন্ধুর দ্বারা বন্ধুর পরিচয় ও সহকর্মী দ্বারা তাঁর কাজের পরিচয়। আযহারী সাহেব নিজে যেভাবে কর্মক্ষেত্রে সফল হয়েছেন তেমনিভাবে তাঁর বন্ধু ও সহকর্মীরাও স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন।

মাওলানা আলাউদ্দীন আল-আযহারী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, লেখক, সংগঠক ও উপমহাদেশের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আলাউদ্দীন আল আযহারীর স্মৃতিকে সমুন্নত রাখা ও তাঁর অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার চেষ্টা চালানোর উদ্দেশ্যে জন্মস্থান সাহেব রামপুরে ১৯৯০ সালের ৫ জুলাই 'মাওলানা আলাউদ্দীন আল আযহারী ইসলামী পাঠাগার' নামে একটি পাঠাগারের নামকরণ করা হয়। উল্লেখ্য ১৯৮৯ সালে উক্ত পাঠাগারটি সাহেব রামপুর ইসলামী পাঠাগার নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯০ সাল থেকে এ পাঠাগার ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অত্র এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ও তাঁর কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা নিয়ে পাঠাগারের পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে ২০০৩ সালের ৬ জুন সাহেব রামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে এক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় 'মাওলানা আলাউদ্দীন আল আযহারী ইসলামী পাঠাগারের' নাম পরিবর্তন করে 'মাওলানা আলাউদ্দীন আল আযহারী ফাউন্ডেশন" নামকরণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। একই বছরে উক্ত ফাউন্ডেশন সমাজ সেবা অধিদপ্তরের অধীনে রেজিস্ট্রেশন করে একটি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে।

মাওলানা আলাউদ্দীন আল আযহারী ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম মাদারীপুর জেলার মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে ও জাতীয়ভাবে পরিচিতি লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকায় "মাওলানা আলাউদ্দীন আল আযহারীর জীবন ও কর্ম" শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং ইসলামী ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে (বায়তুল মুকাররম) আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ওলামায়ে কেরাম, সাংবাদিক ও গবেষকগণ। আলোচকগণ তাদের বক্তব্যে মাওলানা আলাউদ্দীন আল আযহারী তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে দেশ ও জাতির কল্যাণে যে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেছেন তা তুলে ধরেন।

বিশেষ করে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশকে মুসলিম বিশ্বের কাছে একটি মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত করা, বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান করার মাধ্যমে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও মাদারাসা শিক্ষার ঐতিহ্য রক্ষা, লেখনির মাধ্যমে আধুনিক সহজ আরবী ভাষা শিক্ষা ও বাংলাদেশ বেতারে প্রথম আরবী অনুষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে দেশ গড়ার ও পরিচিত করার ক্ষেত্রে যে অবদান রেখে গেছেন তা সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়। এমনকি আলোচকগণ মাওলানা আলাউদ্দীন আল আযহারীকে মরণোত্তর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া ও তাঁর জীবনীকে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করে বাধ্যতামূলক করার দাবী জানান। আযহারীর ফাউন্ডেশনের কাজকে আরো গতিশীল ও ব্যাপক ভিত্তিতে করার লক্ষ্যে ঢাকায়ও একটি কমিটি গঠন করা হয়।

– o –

লেখকের অন্যান্য বই

মুফরাদাতুল কুরআন

কুরআন শরীফের প্রতিটি শব্দের সরল বাংলা অনুবাদ ও সাথে সাথে শব্দটি কুরআন শরীফের কোন সূরার কত নম্বর আয়াতে এসেছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন বুঝতে কিতাবখানি বেশ সহায়ক, প্রতি শব্দের অর্থ যাতে ভালভাবে প্রকাশ পায় সে জন্য কোথাও কোথাও দু'তিন শব্দ একত্র করে অর্থ করা হয়েছে। বর্ণানুক্রম পদ্ধতিতে সাজানো এ বইখানি দিয়ে সহজে কুরআনের শব্দার্থ খুঁজে পাওয়া সহজ হবে।
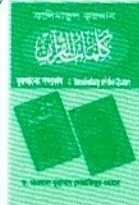
কালিমাতুল কুরআন

আরবী ব্যাকরণের ভিত্তিতে কুরআনের শব্দগুলো বিন্যাস করা হয়েছে। সহজ সাবলীল ভাষায় উহার অনুবাদ করা হয়েছে। সাথে সাথে শব্দটির সুত্র উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি সমপর্যায়ের শব্দ উল্লেখ করায় সহজেই কোরআন বিষয়ে পারদর্শী হওয়া সম্ভব। কুরআনের পাঠক, ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষক তার চাহিদামত কুরআনের যাবতীয় তথ্য উপাত্ত এক নজরে দেখতে পাবেন।

কুরআনের পরিসংখ্যান

কুরআনের তথ্য উপাত্তসমূহ বিভিন্ন আঙ্গিকে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের সূরা, আয়াত, রুকু, পারা, পৃষ্ঠা সূরাগুলোর বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রকারভেদ ছকের আওতায় ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের অজানা বিভিন্ন তথ্যাবলী ও বাংলা ভাষায় কুরআনের উপর রচিত বইসমূহের তালিকা থাকায় কুরআন চর্চার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করেছে।

বাংলাদেশে আরবী চর্চা

ইসলাম ও আরবি ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত শতকরা প্রায় ৯০ জন মুসলিম অধ্যুষিৎ বাংলাদেশে আরবি চর্চার ইতিহাস বহু প্রাচীন। যে কোন কারণেই হোক উহা আজ ভুলার পথে, তাই ঐতিহাসিক দুর্লভ তথ্য দিয়ে সাজানো গ্রন্থখানি সময়ের তাগিদে রচিত। বর্তমান প্রজন্ম ইহা থেকে খানিকটা হলেও মনের খোরাক পাবেন বলে বিশ্বাস।

বিলাদী বাংলাদেশ

বাংলাদেশের উপর আরবীতে লিখিত প্রথম বই,বাংলাদেশের যাবতীয় তথ্যাবলী ঐতিহাসিক ঘটনাবলী,ইসলামী নিদর্শনাবলী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তালিকা দেয়া হয়েছে। আরবিতে লিখিত বইখানি বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী আরব ভাইদের জন্য গাইড বুক হিসেবে কাজে লাগবে।

আরব জাহান পরিচিতি

যে কোন দিক থেকে বিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত আরব বিশ্বের ঘটনাবলী, শেষ হওয়ার তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, দিন দিন আরব বিশ্ব যা পাওয়া গেছে তা দিয়েই সাজানো বইটি পাঠকের মনে কম করে হলেও রেখাপাত করবে। আরবদেশসমূহে ভিসা প্রাপ্তির নিয়ম কানুন উল্লেখ থাকায় বইখানি গাইড লাইনের কাজ দিবে।

উম্মুল কুরা প্রকাশনী ◆ Ummul Qura Prokashani

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, দোকান নং ২২ (২য় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

ফোন ঃ 9337389, 01715432021, 01720053008, 01814353758